কবিতা সিংহ'কে

বছর তিনেক আগে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে পুরানো কলকাতার ভুতুড়ে বাড়ি সম্বন্ধে বলার আমন্ত্রণ পেয়ে তার মাল-মসলা খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল—ইংরেজদের তৈরী শহর কলকাতার আদিকালে তাদেরই প্রশাসনিক প্রয়োজনে তৈরী কতকগুলো বিখ্যাত বাড়ির রোমাঞ্চকর ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা তারা নিজেরাই লিখে গিয়েছে। সেইসব হণ্টেড হাউস অথবা প্রেত-অধ্যুষিত বাড়ি সম্বন্ধে তাদের লেখা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস, গভর্নমেণ্ট রেকর্ডস, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা এদেশীয় প্রেততত্ত্ববিদ্‌দের প্রবন্ধ এবং অভিশপ্ত সেই বাড়িগুলোর বর্তমান বাসিন্দাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত হলো এই গ্রন্থ। ভুতুড়ে বাড়ির ঠিকানা খুঁজতে সাহায্য করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, অসীম হালদার, সমর হালদার, মুনীন্দ্রমোহন বসাক, অজিতকৃষ্ণ গোস্বামী, জীতেনবাবু (পোর্টকমিশনারর্স অফিস) এবং পোর্ট ও রাইটার্সের বিভিন্ন কর্মীরা। মামুলি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাঁদের সহৃদয়তাকে খর্ব করতে চাই না।

—গ্রন্থকার

নিশি রাত। ড্রাইভার নেই। অ্যাসিস্ট্যান্ট নেই। অথচ কে যেন অদৃশ্য হাতে ডকের ক্রেনগুলোকে চালায়। আর ক্রেনের উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে কালো আলখাল্লা পরা কবন্ধ মূর্তি।

মহানগরী কলকাতা।

অনেক ইতিহাসের রক্তস্বাক্ষরের সীমন্তিনী এই শহর কলকাতা। কত খুন, জখম, আত্মহত্যার দুঃসহ আর বীভৎস স্মৃতি বহন করছে এই শহরের কত ভগ্ন, জীর্ণ প্রাসাদ, গঙ্গার ধারে শানবাঁধানো সুপ্রাচীনকালের কত ঘাট, কত দেবায়তন। শোনা যায়, আজও গভীর হয়ে যখন রাত নামে তখন এইসব অভিশপ্ত বাড়ির দূর কোণে কোণে কার যেন বুকচাপা গুমরে গুমরে কান্নার শব্দ চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করে, কোথাও বা কানে আসে কারো অস্থির ও দ্রুত পদধ্বনি। তরল অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঘাটে দেখা যায় কোন বিদেহী সত্তার প্রেতচ্ছায়া। এই রকম প্রেত অধ্যুষিত একটি ঘাটের বিচিত্র ইতিবৃত্ত শুনতে হলে যেতে হবে আমার সঙ্গে —

বেশি দূরে নয়। শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দক্ষিণে গার্ডেনরীচ অঞ্চলে। জায়গাটার নামই ভূতঘাট। বাসের কণ্ডাক্টারও চেঁচিয়ে বলে— ভূতঘাটা—ভূতঘাটা—

টুয়েলভ-সি বাস থেকে নামলাম ভূতঘাটা স্টপেজে। বিকেলের রোদ বাঁকা হয়ে পড়েছে গঙ্গার জলে। যতদূর চোখ যায়, লম্বা গলা জিরাফের মত উঁচু উঁচু ক্রেনগুলো আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর ছোট ছোট ক্রেনগুলো নিতান্ত অবলীলায় ছোঁ মেরে জাহাজ থেকে বড় বড় এক-একটা পেটী তুলে নিচ্ছে, পরমুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে ট্রলির ওপরে। অদূরে হ্যাণ্ড-ট্রাক চলছে বিকট আওয়াজ করে। ডেক-ফোরম্যান, ফিটার, খালাসী, ট্যালিক্লার্ক, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী চারিদিকে ব্যস্ত

হয়ে ছুটোছুটি করছে। শহর কলকাতার কাছেই সদাজাগ্রত যেন এক ময়দানবের পুরী—

গার্ডেনরীচ জেটি। নিশি রাত্রে যখন সমুদ্রগামী জাহাজগুলোর রাশি রাশি আলো আগুনের ফুলের মত জ্বলতে থাকে, দূরে—বহুদূরে গঙ্গার ওপর ভাসমান কোন নিঃসঙ্গ বয়ার আলো তাকিয়ে থাকে প্রেতপাণ্ডুর দৃষ্টিতে আর শাঁ শাঁ বাতাস অব্যক্ত যন্ত্রণার গোঙানির মত আর্তনাদ করতে থাকে ঠিক সেই সময়—সেই সময় আশ্চর্য সব কাণ্ডকারখানা ঘটে—

কি রকম ?

কোথাও কেউ নেই। কিন্তু হঠাৎ দূরে ঘড়ঘড় আওয়াজ শোনা যায়। মনে হয় কে যেন হ্যাণ্ডট্রাক চালাচ্ছে। ক্রেনের অপারেটিং কেবিনে ড্রাইভাব নেই, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নেই অথচ ক্রেনের ডিজেল এঞ্জিনগুলো রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করে ওঠে, গীয়ারে চাপ দিয়ে ক্রেনগুলোকে নিপুণ ড্রাইভারের মতই কেউ ধীরে ধীরে এদিকে-ওদিকে ঘোরায়। আবার হয়তো নাইট-শিফটের কোন দলছুট ফিটার-মিস্ত্রী, কি কোন ডেক-ফোরম্যান একা যাচ্ছে ডিউটিতে, হঠাৎ তার গালে এসে পড়ে প্রচণ্ড একটা থাপ্পড়। সংগে সংগে তার মাথা ঘুরে যায়। অজ্ঞান হয়ে এলিয়ে পড়ে মাটিতে। আরও নানা রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা বলতে বলতে মুখর হয়ে ওঠে ডকের কর্মীরা। তাদের চোখে স্থির বিশ্বাসেব আলো জ্বলজ্বল করে। অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে মুখে।

কিন্তু আমার কেমন অবাক লাগে।

বিশ্বাস করতে মন চায় না। বিংশ শতাব্দীর এই সাতের দশকে যখন মানুষ চাঁদের মাটি দিয়ে জমির উর্বরতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে, স্বপ্ন দেখছে গ্রহান্তরে তার নতুন উপনিবেশ স্থাপনের—এই বিজ্ঞান-নির্ভর যুগে পূর্ব উপকূলের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বন্দরে ভুতের উপদ্রব হয়।

—একথা—বিশ্বাস হচ্ছে না—তাই না ? ট্যালিক্লার্ক বহুদর্শী প্রৌঢ় জীতেন কুশারী বলল, দাঁড়ান যাদের বেশীরভাগই নাইট ডিউটি থাকে—যারা প্রত্যক্ষদর্শী এমন কয়েকজনকে ডেকে—

—আপনি নিজে কি দেখেছেন জীতেনবাবু—আপনার অভিজ্ঞতা বলুন—

—আমি! কয়েক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল। গম্ভীর হয়ে বলল, বলবো—নিশ্চয়ই বলবো। একটু থেমে দূরে আসন্ন রাত্রির রঙে মলিন হয়ে-আসা গংগার দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে আবার বলল, যে আশ্চর্য ঘটনা আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছিল—ভয়ে আতংকে একেবারে মরে যেতে বসেছিলাম সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা আপনাকে বলতেই হবে—বলেই ব্যারাক থেকে ডেকে নিয়ে এল দুইজনকে।

তাদের একজনের নাম আনসারী ইসলাম। পাঞ্জাবী মুসলমান। ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর বয়স। অনেকদিন মিলিটারিতে ছিল। এক্স-মিলিটারিম্যান হিসেবেই পোর্টের চাকরিতে এসেছে ১৯৭০ সালে। সে নিজের চোখে যা দেখেছে, প্রথম নাইট-ডিউটির রাত্রির সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এখানে সংক্ষেপে বলা হলো—

আনসারী হেভি-লিফ্ট ক্রেনের ড্রাইভার। মিলিটারিতেও সে এই কাজই করতো। নাইট-ডিউটিতে ক্রেনের ওপরে বেশ প্রশস্ত অপারেটিং কেবিনে ঘুমানো তার বরাবরের অভ্যাস। চাকরিতে জয়েন করার দুইদিন পরেই তার নাইট-ডিউটির পালা এল। সে যথারীতি কম্বল-বালিশ বগলে নিয়ে যেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে যাবে অমনি তার রিলিভার বাধা দিয়ে বলল, সাহেব করছেন কি—

—কেন? কেবিনে যাচ্ছি ঘুমোতে।

সহকারী ডকের কাজে চুল পাকিয়েছে। সে শুধু অনেক—অনেক উঁচুতে এক দলা নিকষ কালো অন্ধকারের মত কেবিনের দিকে ভীত চোখে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, ওপরে কেবিনে ঘুমোতে পারবেন না—

—কেন—মশা?

—না সাহেব। ওখানে খুব বাতাস। মশা কি করে আসবে?

—তাহলে বলবে তো কেন কেবিনে যাবো না!

রিলিভার আর কুলীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

—কি ব্যাপার—জিন-টিন আছে নাকি, বলেই হো হো করে হেসে উঠল আনসারী। ছোটকাল থেকেই সে একটু বেপরোয়া। ডাকাবুকো ধরনের মানুষ। ইয়ার-দোস্তদের সংগে বাজি ধরে সে কতদিন রাত্রে একা গোরস্থানে গিয়েছে। ফাঁকা মাঠের ভেতরে একলা বসে মড়া আগলেছে।

জিন পরী ভূত প্রেত পিশাচ—ওসব 'দুবলা' মানুষের মনের 'খোয়াব' বলে তার মনে হয়। অতএব সে গটগট করে ওপরে চলে গেল।

বেশ বড় ঘর। জানালার কাঁচের শার্শি খুলে দিতেই হু-হু বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরে। কম্বল মুড়ি দিয়ে বেঞ্চের ওপরে শুয়ে পড়ল আনসারী। আর প্রায় সংগে সংগেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঠন্-ঠন্-ঠন্। ক্রেনে ওঠার লোহার সিঁড়িতে শব্দ হতে লাগল। ঘুম ভেঙে গেল আনসারীর। কয়েক মুহূর্ত কান পেতে শুনল সেই আওয়াজটা। তার মনে হলো—লোহার নাল-লাগানো জুতো পায়ে দিয়ে কেউ যেন ওপরে উঠছে। তাকে নিশ্চিন্তে আর আরামে ঘুমোতে দেখে হয়তো তার ইউনিটের কারো শখ হয়েছে তার সংগে কেবিনে ঘুমানোর। আসুক—দরজায় নক করুক—তখন দেখা যাবে—সে পাশ ফিরে ঘুমানোর চেষ্টা করল। কিন্তু—

আবার—সেই শব্দ—ঠন্-ঠন্-ঠন্—এবারে আওয়াজটা বড্ড কাছে বলে মনে হলো। লোকটা তার ঘরের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে মনে হচ্ছে। ঘুম চোখদুটো কচলে নিয়ে সশব্দে দরজা খুলল আনসারী। আর আশ্চর্য হয়ে গেল সে। অন্ধকারে একটা অতিকায় সরীসৃপের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে লোহার সিঁড়িটা—তার কোথাও কেউ নেই।

নিশ্চয়ই তার সহকর্মীরা তাকে ভয় দেখাচ্ছে। এবার থলি থেকে টর্চলাইটটা বের করে মাথার কাছে রেখে শুয়ে পড়ল আনসারী। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল, সিঁড়িতে আবার সেই রহস্যজনক শব্দ হয় কি না! খাটাখাটুনির শরীর তো! কখন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল তা সে জানে না।

না। এবারে আর জুতোর আওয়াজ নয়। একেবারে তার কেবিনের দরজায় খুব জোরে কে যেন ধাক্কা দিতে লাগল। সে কী শব্দ! মনে হয়, দরজা ভেঙে ফেলবে বুঝি। কি ব্যাপার! ডিউটির টাইম হয়ে গেল নাকি? ধড়মড় করে উঠে বসে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ফেলল আনসারী। জ্বালল টর্চ। টর্চের আলো বন্দুকের গুলির মত আছড়ে পড়ল সিঁড়িতে। আর সংগে সংগে হিম হয়ে গেল তার বুকের রক্ত। সে স্পষ্ট দেখল—সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছে একটা কবন্ধ ছায়ামূর্তি। তার গায়ে রুপোর জরি-বসানো কালো একটা আলখাল্লা। দেখতে দেখতে সেই

ছায়াদেহ নীচে নেমে ব্রেকরুমের পাশ দিয়ে দূরে অন্ধকার রেলওয়ে ইয়ার্ডের দিকে মিলিয়ে গেল।

আরো একজন।

মাগুনি রাউত।

ডেক-ফোরম্যান। জাহাজের 'হ্যাচ' অর্থাৎ খোল থেকে মাল খালাস করে যে কুলীরা তাদের খবরদারী করা তার কাজ। সে বলল, একেবারে আশ্চর্য ঘটনা স্যার—কত জ্ঞানীগুণী এলেমদার লোককে এর কারণ—

—আঃ, ধানাই-পানাই না বলে তুমি কি দেখেছো তাই বলো না রাউত।

—সেদিন চারনম্বর জেটিতে একটা জার্মান জাহাজ থেকে মাল আনলোডিং-এর কথা ছিল। আমার দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমি জোরে পা চালিয়ে যাচ্ছি—টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গংগার বাতাসের একটানা হু-হু শব্দকেও ছাপিয়ে আমার কানে এল—ডানা ঝটপট করে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাওয়ার শাঁ শাঁ আওয়াজ। আমার মনে হলো, পাখিগুলো যেন উড়ে চলেছে দূরে—বহুদূরে গংগা পেরিয়ে অন্ধকার দিগন্তের দিকে। আর অনেক—অনেক দূর থেকে বাতাসে ভেসে এল তাদের ডাক—ইয়াহু—ইয়াহু—উ—উ—

থামল মাগুনি। এখনো তার চোখে আতংকের ছায়া কাঁপছে। সে যেন দেখতে পাচ্ছে—সেই রাত্রির বিচিত্র আর ভয়াল সেই দৃশ্য। আচ্ছন্নের মত সেই ভাবটা কাটিয়ে আবার আস্তে আস্তে বলল মাগুনি,—স্যার, উড়িষ্যায় আমাদের বাড়িতে তিন পুরুষ ধরে আমরা পায়রা পুষি। সিরাজু, গুলী, লক্কা, লোটন আরও বহু জাতের পায়রা হয় স্যার। যে পায়রা রাতদিন বক্‌বকম্ করে তারাই ডাকে 'ইয়াহু' বলে। সেই রাত্রে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, মেঘঢাকা আকাশ—তার ভেতরে ডকে ইয়াহু পায়রা এল কোথা থেকে—কে জানে! দু'হাতে বুকটা চেপে ধরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাগুনি।

আমি জেটির দিকে চলতে শুরু করলাম, আবার বলতে শুরু করল মাগুনি,—কয়েক পা যেতেই মেয়েলী গলায় গানের মধুর স্বর কানে এল।

এইবার আমার গা ছমছম করতে লাগল। বন্ধুবান্ধবদের মুখে শুনেছি ডক এলাকা জুড়ে জিন-পরীদের উৎপাত আছে—তবে কখনো আমার নজরে কিছু পড়েনি স্যার। কিন্তু সেই রাত্রির পর থেকে—

থেমে গেল মাগুনি। দূরে রেলওয়ে মার্শালিং ইয়ার্ডের দিকে চোখ দু'টো কুঞ্চিত করে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল,—কি আর বলবো, কী যে হলো স্যার—যাবো না, যাবো না করেও—আমি সেই গানের সুর লক্ষ্য করে চলতে শুরু করলাম। যত এগোতে লাগলাম গানের আওয়াজ ততই দূরে সরে যেতে লাগল। আমারও কেমন রোখ চেপে গেল,—দেখতেই হবে কে এত মনপ্রাণ ঢেলে গান গাইছে। এমন মিষ্টি গলায় যে গান করছে সে নিশ্চয়ই অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু—স্যার—কি বলবো আপনাকে—যেই রেললাইনের কাছে গেলাম হঠাৎ থেমে গেল গান। আর আবছায়া অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখলাম—লাইনের ওপরে আড়াআড়িভাবে পড়ে রয়েছে একটা লাশ! তার চারিপাশ কেমন ভেজা ভেজা মনে হলো। নিশ্চয়ই শাণ্টিং-এর সময় কোন হতভাগা কাটা পড়েছে। আতঙ্কে, উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ডাকলাম—কে কোথায় আছো—শীগ্‌গীর এসো—মানুষ কাটা পড়েছে—এ—

কেউ এল না। আমি তখন ছুটলাম চারনম্বর শেডের দিকে। সেখান থেকে টেলিফোন করলাম ডকের হাসপাতালে। কয়েক মিনিট পরেই হেডলাইট জ্বালিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ভ্যানও চলে এল। এলেন ডাক্তারবাবুও। যেখানে লাশটা পড়ে রয়েছে সেখানে গাড়ি যাবে না। তাই আমরা সদলবলে যেই সেদিকে হাঁটতে শুরু করলাম—হঠাৎ থেমে গেল মাগুনি রাউত। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল।

—লোকটা বেঁচেছিল তখনো?

কোন কথা বলল না রাউত। তার চোখে কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ফুটে উঠল। বিড়বিড় করে নিজের ভাষায় বলল, যে মনিষটা কাটি গলা—সে—

—কি দেখলেন সেখানে?

—কি আর বলবো স্যার, আমরা গিয়ে দেখলাম সেখানে কিচ্ছুই নেই। পাথরের নুড়ি আর স্লিপারের ওপরে বসানো চকচকে রেললাইনের ওপরে ঝুঁকে পড়ে আমরা দেখলাম সেখানে রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

গঙ্গার বুকে সন্ধ্যা নামছে।

কাছে, দূরে যতদূর চোখ যায় ঝাপসা অন্ধকারে ক্রেনগুলো এক-একটা অতিকায় প্রেতচ্ছায়ার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার কেমন আশ্চর্য মনে হলো—কলকাতার প্রচণ্ড জীবনাবর্তের এত কাছে এই গার্ডেনরীচ জেটিতে—এইরকম ভুতুড়ে ব্যাপার—

—এখানে এসব কেন হবে না বলতে পারেন? ট্যালিক্লার্ক জীতেন কুশারী আমার দ্বিধাগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, খিদিরপুর থেকে একেবারে দক্ষিণে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত সমস্ত ডক এলাকাটা জুড়ে এই মাটিতে এক হতভাগা নবাবের দীর্ঘশ্বাস মিশে রয়েছে—

—মানে, কার কথা বলছেন?

—কেন, জানেন না, অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিল ইংরেজরা? তাজ ও তখত্ হারিয়ে রাজধানী লখনউ ছেড়ে বাদশাহ কলকাতায় এলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাকে গঙ্গার ধারে তিনটে বড় বড় বাড়িতে থাকতে দিয়েছিল, একটু থামল কুশারী। কেন যেন একটা বড় নিশ্বাস ফেলে আবার বলতে শুরু করল—বাদশাহের যেমন ছিল ইমারতের শখ, তেমনি ছিল গানবাজনার। শুনেছি তৈরি করেছিলেন নদীর ধারে ধারে কুড়িটারও বেশি মহল, সেই সঙ্গে ছিল তার 'মহলসরা' অর্থাৎ হারেম। প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে ছিল নানারঙের ফুলে ফুলে ভরা ঘন সবুজ গাছগাছালিতে ঢাকা সুন্দর সুন্দর বাগান। হারেমে পরীর মত সুন্দরী শত শত বেগম-বাঁদী ছাড়াও ছিল—হঠাৎ থেমে গেল সে। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস-ফিস করে বলল, আর স্যার নাচে গানে ওস্তাদ অনেক রূপসী বেশ্যাও না কি থাকতো এখানে—যেমন মুনসরিমওয়ালী গ্যহর, চুনেওয়ালী হায়দরী, জোহরা, মুশতরী, আরো অনেকে—

—আপনি এত কথা জানলেন কি করে?

ম্লান হাসি ফুটে উঠল কুশারীর মুখে। মাথা নীচু করে বলল, বেহালার বিখ্যাত গাইয়ে বামাচরণ মুখুজ্যে ছিলেন ওয়াজিদ আলী শাহের মেটিয়াবুরুজের দরবারের গায়ক। তিনি ছিলেন আমার পিতৃদেবের বন্ধু। আমি স্যার বাবার মুখেই নবাবী আমলের এসব বৃত্তান্ত শুনেছি। একটু থেমে দূরে গঙ্গার ওপারে ঘন সবুজ গাছপালায় আচ্ছন্ন বোটানিক্যাল

গার্ডেনের কালিঢালা অন্ধকারের দিকে চোখ দু'টো সরু করে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, নবাব-বাদশাদের হারেমে যা হয়ে থাকে—যা হয়—কত গুম খুন, জ্যান্ত কবর দেওয়া, বিষ দিয়ে হত্যা করা, আত্মঘাতী হওয়া—সে সবই তো এখানে হয়েছে—সেই সব অভিশপ্ত আত্মাগুলো কোথায় যাবে বলুন ?

অপমৃত্যু হলেই তারা প্রেতাত্মার রূপ ধরে তাদের পুরানো জায়গায় ঘোরাফেরা করে কিনা—প্রেততত্ত্বের সেই চিরকালের জটিল রহস্যের মীমাংসার আগে জানা দরকার কবে কতদিন আগে লখনউয়ের রাজ্যহারা নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ কলকাতা প্রবাসে কাটিয়েছিলেন ? নৃত্যগীতে পটিয়সী সুন্দরী বারবনিতা পরিবৃত হয়ে নাচে গানে রঙ-তামাশায় দিন যাপন করতেন বলেই কি মহলসরার বেগমদের মনে হিংসার আগুন জ্বলতো —আর সেইজন্যেই কি খুন-জখম হতো ? মেটিয়াবুরুজের শাহীমহলের প্রাসাদে কয়টা অপঘাত মৃত্যু হয়েছিল ? জীতেন কুশারীর পিতৃদেবের মুখে শোনা কথার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি ? ক্রেন-ড্রাইভার আনসারী, ডেক-ফোরম্যান মাগুনি রাউত এবং ডককর্মীদের আরো অনেকে আজও গভীর রাত্রে যা প্রত্যক্ষ করে থাকে—সেসব কি একেবারেই অলীক ?

রাজ্যচ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের সমসাময়িক কালের ইতিহাস, বিভিন্ন রেকর্ড এবং নথিপত্র থেকে তাঁর মেটিয়াবুরুজের শাহীমহলের রহস্যময় ইতিবৃত্তের যে আভাস পাওয়া যায় তারই ভিত্তিতে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর এখানে সংক্ষেপে বলা হলো—

ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-৫৬) যখন উদয়পুর, সম্বলপুর, সাতারা, ঝাঁসি—একটির পর একটি দেশীয় রাজ্য নানা অজুহাতে আত্মসাৎ করছিলেন সেই সময় তিনি অযোধ্যাকেও কোম্পানি-গভর্নমেণ্টের অধিকারভুক্ত করে নিয়েছিলেন (৭ঠা ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬)। ওয়াজিদ আলী সদলবলে কলকাতায় এসেছিলেন ৬ই মে ১৮৫৬ সালে। মেটিয়াবুরুজ তথা গার্ডেনরীচ অঞ্চলে বসবাস করেছিলেন পুরো একত্রিশটি বছর অর্থাৎ ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত।

গার্ডেনরীচ প্রসঙ্গে Thacker's Guide to Calcutta বলেছে*,

* Thaker's Guide to Calcutta, Ferminger, P. 112

Garden Reach—establishment of the ex-king of Oudh.

উর্দু ভাষায় লেখা 'গুযিশ্‌তা লখনউ'তেও (পুরানো লখনউ) আছে+ মাটিয়াবুর্জে (মেটিয়াবুরুজ) নদীর তীরে তীরে চওড়ায় এক কি দেড়মাইল আর লম্বায় ছয় সাত মাইল জায়গা বাদশাহ এবং তাঁর মুসাহিব লশকরদের (সাঙ্গোপাঙ্গ অথবা কর্মচারী) জন্য দেওয়া হলো। এইখানেই দক্ষিণে মেটিয়াবুরুজ থেকে উত্তরে গার্ডেনরীচ পর্যন্ত জায়গা জুড়ে ওয়াজিদ আলী শাহ তৈরি করেছিলেন অনেক সুদৃশ্য ইমারত—বিচিত্র তাদের নাম—সুলতানখানা, শাহনশাহ মঞ্জিল, মুরস্‌সা মঞ্জিল, আসাদ মঞ্জিল, তহ্‌নিয়ত মঞ্জিল নূরমঞ্জিল, কস্র-উল-ব্যায়া, আশমানী ইত্যাদি। খাস 'সুলতানখানা'র (বাদশাহের আবাসস্থল) প্রধান তোরণে ছিল 'শানদার' (জাকজমক পরিপূর্ণ) নহবতখানা। গুযিশ্‌তা লখনউয়ের ভাষায় বলি—মোদ্দা কথা কলকাতার কাছে দ্বিতীয় লখনউ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।…সেদিন লখনউ আর লখনউ ছিল না—মেটিয়াবুরুজই ছিল লখনউ। সেই জীবন, সেই জবান, সেই কবি, সেই আসর—সেই প্রমোদ উপকরণ।—সেই মুর্গীবাজি, বটেরবাজি, আফিমখোর, ফানুস ও ঘুড়ির নেশা! সেই কথকতা, মর্সিয়া (মহরমের শোকগীতি), তাজিয়াদারী!

একথা ভাবতে কেমন আশ্চর্য মনে হয়, আজ যেখানে পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষার টুকরো টুকরো কথায়, কুলীদের হাঁকে-ডাকে মুখরিত বন্দর সেইখানেই মাত্র নব্বই বছর আগেও ছিল 'আসাদ মঞ্জিল' যেখানে হতো কলকাতার হিন্দু মুসলমান কবিদের 'মুশাইরা'[১] জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতদের সমাবেশ হতো সুলতানখানার সদর মোকামে,[২] আর মুরস্‌সা মঞ্জিলের বিশাল চত্বরে মনজিলওয়ালী, ঝুমুরওয়ালী, রাসওয়ালী ইত্যাদি চটকদার নামে বিভক্ত 'মুত্‌আশ্‌শা'[৩] রূপসী বেগমদের বিভিন্ন দল নিয়ে স্বয়ং জাহাপনাই রাসলীলায় মত্ত হয়ে উঠতেন; এইখানেই লখনউয়ের প্রখ্যাত বারবিলাসিনী মুনসরিমওয়ালী গহ্বরের মধুর কণ্ঠে সংগীতজ্ঞ বাদশাহের সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি কন্নড় (শ্যাম),

---

+ গুযিশ্‌তা লখনউ—আব্দুল হলীম শরর্‌, পৃঃ ৬৮

(১) কবিসম্মেলন (২) ড্রইংরুম (৩) শিয়া মুসলমানদের ভেতরে প্রচলিত সাময়িক বিবাহ বন্ধন।

জুহী, যোগী আর 'শাহপসন্দ' রাগিনীতে সুললিত গানের সুরে চারিদিক আচ্ছন্ন ও বিবশ হয়ে যেত।

কিন্তু মেটিয়াবুরুজের এই নাচে-গানে উচ্ছ্বসিত প্রেম-প্রণয়লীলার আনন্দময় পরিবেশের আড়ালেই কোথাও বিষধর সাপের মত কুটিল হিংসা ফণা তুলে ধরতো ; কোথাও কোন মহলসরার দূর কোণে ঘনীভূত হয়ে উঠতো গুপ্তহত্যার হীন চক্রান্ত।

দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল ওয়াজিদ আলীর মৃত্যুর চার বছর আগে অর্থাৎ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। মেটিয়াবুরুজের শাহীমহলের জীবনে তখন প্রমোদ-রঙের জোয়ার বয়ে চলেছে। বাদশাহের দুর্বার নারীসঙ্গলিপ্সা, অহরহ সুন্দরী মুতআশুদা বেগমদের নিয়ে নাচগানে বিভোর হয়ে থাকা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারতো না তার খাস বেগম—নবাব আখতার মহল। কিন্তু যার শখের চিঁড়িয়াখানায় জানোয়ারের চেয়েও অনেক বেশি বেগমের সংখ্যা তাকে এসব বলা আর পাথরের দেয়ালে মাথা ঠোকা একই কথা। কিন্তু যখন থেকে লখনউয়ের বাজারের বেশ্যা মুনসারিমওয়ালী গ্যহরের সঙ্গে নবাব খুব বেশি মাখামাখি করতে শুরু করল তখন রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ল আখতার মহল। বলল, ছি! ছি! আপনি কি করছেন বলুন তো জাঁহাপনা—আপনাদের বংশের কেউ কখনো বাজারের কোনো বেশ্যার মুজরা দেখেছেন বলে তো শুনি নি—

—বাজারের বেশ্যা! কার কথা তুমি বলছো।

—কেন ওই যে গ্যহর না কে—সে লখনউয়ের বাজারের রাণ্ডী ছাড়া—

—খবরদার, যা বলেছো কখনও তা আর বলবে না—গ্যহরের মত গানের গলা তামাম হিন্দুস্থানে নেই।

একটা কথাও বলল না আখতার। শুধু অভিমানে মুখ ভারী করে চলে গেল তার মহলসরায়।

ওয়াজিদ আলী শাহ সংগীতশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী এবং সুপুরুষ বলেই সুকণ্ঠী গায়িকা চুনেওয়ালী হায়দরীও ছিল তার প্রতি গভীরভাবে প্রণয়াসক্ত। বাদশাহ গ্যহরের সান্নিধ্যে বেশীক্ষণ থাকলেই তারও বুকের ভেতরে হিংসার আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলতো।

যেদিন মুরাস্সা মঞ্জিলের উদ্যানের মুক্তাঙ্গন মঞ্চে বাদশাহের রচিত

রহস্যলীলার (রাস) অভিনয় চলছিল সেই সময়েই ঘটে গেল সেই ভয়াবহ কাণ্ডটা।

মঞ্চের চারিদিকে হেমদণ্ডের শীর্ষে জ্বলছে উজ্জ্বল দীপাধার। বাজছে বীণ, বাজছে সারেংগী, বাজছে চং আর সরোদ, উঠছে দুন্দুভির গম্ভীর ধ্বনি। সেই সুমধুর ঐকতানের সংগে তাল মিলিয়ে যেন মরালীর মত ভেসে ভেসে এল মুত্‌আশুদা বেগমদের রাধা মনজিলওয়ালী দলের সুঠাম-তনু নর্তকীরা। সুযৌবনা নৃত্যপটিয়সীরা লীলায়িত ভংগীতে চিত্ত-বিভ্রমকারী মুদ্রা রচনা করে নৃত্য করে যেতে লাগল। মুগ্ধ বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে গেল কলকাতার দর্শকরা। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল স্বরযন্ত্রের সেই সুমধুর ঐকতান। রূপরম্যা নর্তকীরা নেপথ্যের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বাতাসে ভেসে এল দূরাগত মুরলীর ধ্বনি। বেজে উঠল মৃদঙ্গ। ধীর পদক্ষেপে মঞ্চে এল শ্রীকৃষ্ণরূপী শাহনশাহ। মাথায় মুকুট। হাতে বাঁশি। পরনে রেশমের পীতবস্ত্র। নেপথ্যে যেই বেজে উঠল নূপুরের নিক্কন অমনি নাগকেশর বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল কানাই। গোপিনীদের অগ্রনায়িকা দীর্ঘতনু অপূর্ব সুন্দরী মুনসরিমওয়ালী গ্যহর তার সখীদের নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করল। আর তাদের প্রিয়তম কানাইকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজতে লাগল মধুর করুণ সুরে গান গেয়ে গেয়ে—"অ্যায় কানহাইয়া-বত্‌খুর সনদম তু বুঅ্যায় কসে দারী"—

আগুন—আগুন—আগুন—সেই শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশকে বিদীর্ণ করে দিয়ে বাওআর্চীখানার দিক থেকে আর্তস্বর শোনা গেল। বিভিন্ন বাড়ির মহলসরা থেকে বেগম বাঁদীদের আর্তনাদে, পাহারাদার সেপাইদের হাঁকেডাকে, মকানদারদের ছুটোছুটিতে মুহূর্তে যেন মেটিয়াবুরুজের শাহীমহল্লে মহাপ্রলয় নেমে এল! কে যেন অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত এসে মঞ্চের আলোগুলো নিভিয়ে দিল। প্রধান খোজা মীর বসির ছুটে এসে হতভম্ব নবাবকে সুলতানখানার নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গেল। গোপিনীরা যে যার মহলের দিকে ছুটল। কিন্তু গ্যহর যেই দ্রুত পায়ে পালাতে গেল অমনি কারা যেন ছুটে এসে তার মুখের ভেতরে কাপড় গুঁজে দিল। আর কালো ওড়নায় আপাদমস্তক ঢেকে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে ফেলে দিল লেলিহান আগুনে জ্বলন্ত সেই বাওআর্চীখানার ভেতরে।

কেউ বলে নবাব আখতার মহল, কেউ বলে চুনেওয়ালী হায়দরী মনসরিমওয়ালী গ্যহরকে ষড়যন্ত্র করে পিড়িয়ে হত্যা করেছিল।

আরো একজন খুন হয়েছিল এই শাহীজনপদে।

মীর আমন আলী। কবুতরবাজ। কবুতরবাজির কলাবিদ্যায় যার জুড়ি ছিল না। গুযিশতা লখনউ থেকে জানা যায়, মেটিয়াবুরুজে বাদশাহের বিভিন্ন বাড়িতে সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ হাজারেরও বেশি পায়রা ছিল। তিনশো কবুতরবাজ তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতো। এই কবুতরবাজদের প্রধান ছিল—মীর আমন আলী। আবার কবুতরবাজদের ওপরে ছিল একজন দারোগা—গুলাম আব্বাস।

যে রং দরকার মীর আমন আলী পায়রার গায়ে সেই রং করে দিতে পারতো। পায়রার গায়ের জায়গায় জায়গায় পালক তুলে ফেলে সেই ছিদ্রে অন্য রঙের পালক রেখে এমনভাবে জমিয়ে দিত যে আসল পাখার মতই পায়রার শরীরে লেগে থাকতো। সেই রং এত পাকা যে ফিকে হওয়ার উপায় ছিল না। শুধু যে নিপুণ শিল্পীর মত তার রঙের হাত ছিল তা নয়, ছীপির [১] সাহায্যে সেই রং-করা পায়রাদের এমন করে ওড়াতে পারতো, দূর থেকে মনে হতো কতগুলো রঙিন ফুলের পাপড়িই যেন বাতাসে উড়ছে। তাই শাহীজনপদের বাসিন্দারা মীর আমন আলীকে ডাকতো 'ওস্তাদজী' বলে।

শুধু গুণ নয়। রূপও ছিল ওস্তাদজীর। তরুণ সুবেদারের মতই দীর্ঘ চেহারা। দুধে-আলতা মেশানো গায়ের রঙ। কবুতরবাজ হলে কি হয়—তার পোশাক-আশাক ছিল শরিফদের মত—মাথায় কালিবের [২] ওপরে চড়ানো চ্যাগোশিয়া [৩] টোপি, গায়ে আলখাল্লার মতই জরিবসানো আংগরাখা, পরনে পায়চার পায়জামা, কাঁধের ওপরে চিকন বা জালির রুমাল।

বাদশাহের প্রতিটি বাড়িতেই পায়রা থাকতো বলে মীর আমনের সব মঞ্জিলের মহলসরাতেই অবাধ গতিবিধি ছিল। তবে তার বেশি আনা-গোনা ছিল তহনিয়ত মঞ্জিলে নবাব আবরসা বেগমের কাছে।

---

(১) ছীপি—দড়ি বা লাঠি যার সাহায্যে পায়রা ওড়ানো হয়; (২) কালিব—কাঠের ফ্রেম; (৩) চ্যাগোশিয়া—এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত ঢাকা সুদৃশ্য টুপি।

নবাব আবরসাঁ বেগমের একটু ইতিহাস আছে। ওয়াজিদ আলী শাহের খাসবেগম নবাব আখতার মহালেব নূরসুসা মঞ্জিলে জল দিতে আসতো এক তরুণী ভিশ্তিনী। তার ওপরে নজর পড়ল বাদশাহের। তাকে মুতআ করে খেতাব দিয়েছিল নবাব আবরসা বেগম। আবরসা বেগমের পায়রার খুব শখ ছিল। তাই সময়ে অসময়ে মীর আমনের ডাক পড়তো তহ্-নিয়ত মঞ্জিলে। মীর আমন পায়রা ওড়াতো নানা কৌশলে। আর বেগম খুশী হয়ে তাকে ইনাম দিত। কবুতরবাজের সংগে বেগমের এই মাখামাখিটা একেবারেই সহ্য করতে পারতো না কবুতরবাজদের দারোগা গুলাম আব্বাস। বেগমের ওপরে আব্বাসের ছিল দুর্বলতা।

একদিন নির্জন দুপুরে তহ্‌নিয়ত মঞ্জিলের ছাতে দু-শো পায়রার একটা ঝাঁক উড়িয়ে দিয়েছিলো মীর আমন। পায়রাগুলো মালার মত চক্রাকারে বেগমের ওপরে ছায়া ফেলে উড়ছিল। আর আবরসাঁ কিশোরীর মত খুশীতে ভেঙে পড়ে হাততালি দিয়ে নাচছিল—

—তোমাকে কতদিন বলেছি না—এখানে আসবে না, রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ল আব্বাস। তার সামনে এসে দাঁড়াল আবরসাঁ। চোখ পাকিয়ে বলল, ওকে ধমকাচ্ছো কেন—আমি ডেকেছি বলেই সে এখানে আসে। একটু থেমে নীচু গলায় বলল, তুমি যে আমার কাছে যখন তখন আসো—তুমি কি ভেবেছো আমি তোমার কেনা বাঁদী—

মীর আমনের সামনেই এইভাবে অপমানিত হয়ে রাগে উত্তেজনায় আব্বাস না কি ওয়াজিদ আলী শাহকে নালিশ করেছিল।

বাদশাহ কি বলেছিল জানা যায় না। কিন্তু এই ঘটনার দিন কয়েক পরেই খাস সুলতানখানার পিছনে যে সরু গলি দিয়ে বাওআর্চী-খানসামারা বিভিন্ন মঞ্জিলে আসতো সেই রাস্তার ওপরেই মীর আমনের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

কে জানে, ডেক-ফোরম্যান মাগুনি রাউত ডকের রেললাইনের ওপরে আড়াআড়িভাবে সেই একশো বছর আগের মীর আমনের প্রেতাত্মাকেই পড়ে থাকতে দেখেছিল কি না?

মেটিয়াবুরুজের নয়াবসতির জনপদে আরও একটা অপমৃত্যু ঘটেছিল ওয়াজিদ আলী শাহ দেহান্ত হওয়ার পর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি।

এবারে শাহীমহলের বেগমদের কুটিল হিংসা আর হীন স্বার্থপরতার শিকার হয়েছিল বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র—

মির্জা বিরজীস কদ্র। সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে লেখা আছে বিরজীসের নাম। ১৮৫৬ সালে ওয়াজিদ আলী কলকাতায় চলে আসার পরেই লখনউতে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। এলাহাবাদ এবং ফয়জাবাদ থেকে গদরের (বিদ্রোহী) নেতারা বিপুল এক জনতা নিয়ে হৈ হৈ করে এসে জমায়েত হল লখনউয়ে। অওধের শাহী পরিবারের কাউকে না পেয়ে ওয়াজিদ আলীর দশ বছরের নাবালক পুত্র মির্জা বিরজীস কদ্রকেই বসিয়ে দিল তখ্‌তে। বিরজীসের মা নবাব হযরত মহল হলো তার মুখ্‌তার (প্রতিনিধি)। কিন্তু বিরজীস গদীতে বসার ছয়-সাত মাস পরেই ইংরেজ সৈন্য কামান নিয়ে লখনউতে প্রবেশ করলো আর মুষলধারে গোলাবর্ষণ করতে লাগল। হাজারে হাজারে লোক পালাতে লাগল। হযরত মহল বিরজীসকে নিয়ে পালিয়ে গেল নেপালে। কয়েকবছর পর নেপালেই হযরত মহল মারা গেল। মহারানী ভিকটোরিয়ার জুবিলীর সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিরজীসকে ক্ষমা করল এবং নেপাল থেকে ফিরে আসার অনুমতি দিল। বিরজীস সোজা চলে এল মেটিয়াবুরুজে। ফিরে এসেই বিরজীস গভর্নমেণ্টের কাছে দাবি করল— সর্বাধিক বেতন। সবচেয়ে বেশি ভাতা তখন মঞ্জুর করা হয়েছিল জ্যেষ্ঠ যুবরাজ মির্জা কমর কদ্রকে। শুধু তাই নয়, বিরজীস গভর্নমেণ্টকে জানালো, মেটিয়াবুরুজের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এবং সেখানকার আত্মীয়স্বজনদের খবরদারীও তার জিম্মায় দেওয়া হোক। বলাবাহুল্য ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন বিরজীসের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। যেই বিরজীস তদ্‌বিরের জন্য ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার তোড়জোড় করতে শুরু করল তখন কমর কদ্রের মা নবাব মাখজারিয়া উজমা বেগম তাকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল।

ইতিহাসে এই বাদশাহী দাওয়াতের (নিমন্ত্রণের) বিবরণ আছে :— আসাদ মঞ্জিলের খাওয়ার ঘরে দীর্ঘ ফরাসের ওপরে নকশাকাটা ফুল তোলা দস্তরখানা (চাদর) বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার ওপরে ঝকমক করছিল অনেকগুলো রুপোর ডিশ। তার সাতটি ডিশে সাতরকমের

পোলাও ছিল—গুলজার পুলাও, নুর পুলাও, কোকো পুলাও, চমুবেলী পুলাও, মোতী পুলাও, নওরতন পুলাও আর ছিল আনারদানা পুলাও। পুলাওয়ের আনুষঙ্গিক বিরিয়ানি, কোরমা, কাবাব এবং শীরমাল (দুধে ময়দায় তৈরী খামিরী রোগনী রুটি) তো ছিলই !

তহ্নিয়ত মঞ্জিলে সেদিন বেগম মাখজারিয়া উজমা ছাড়া অন্যান্য বেগমরাও উপস্থিত ছিল।

গদরের সময় বিরজীস তখ্তে বসেছিল। বিপ্লবীরা তাকে অওধের নবাব বলে অভিনন্দিতও করেছিল। তাই বেগমরা তাকে স্নেহ এবং সমীহ করতো। আর ইংল্যাণ্ডে রানীর কাছে তদ্বির করে যদি ওয়ারীশ-নামা আনতে পারে তাহলে মেটিয়াবুরুজের শাহীজনপদ-জীবনের জাঁকজমক বজায় থাকবে। তাই বিরজীসের ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার সিদ্ধান্তে বেগমরা খুশীই হয়েছিল। কিন্তু তাদের মনের ভেতরে কার কোন গোপন দুরভিসন্ধি ছিল তা কে জানে ?

খেতে বসে বিরজীস প্লেটের ওপরে স্বযত্নে সাজিয়ে রাখা রঙিন জহরতের মত আনারদানা পুলাওয়ের (যার প্রত্যেকটা চাল অর্ধেকটা লাল আর অর্ধেক সাদা কাঁচের মত ঝকমকে) দিকে তাকিয়ে নাকি সন্দেহও প্রকাশ করেছিল। ঘুরিয়ে বলেছিল—অনেকদিন নেপালে পাহাড়ে-জঙ্গলে থেকে এসব বাদশাহী খানা খাওয়ার অভ্যেস নেই। আমি শুধু চামুবেলী পুলাওটা খাবো—

—না-না, বলো কি ! খোদ নবাব বেগম সাহিবা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তৈরি করেছেন এসব খানা—তোমাকে খেতে হবে, বলেছিল মাখজারিয়া উজমা।

সাত রকমের পুলাওই খেতে হয়েছিল বিরজীসকে। দাওয়াত সেরে ঘরে ফিরে আসতে না আসতেই ভেদবমি শুরু হলো। সেই রাত্রেই শেষ নিশ্বাস ফেলল বিরজীস।

উচ্চাভিলাষী এই বিরজীসের অভিশপ্ত আত্মাই কি আজও নিশিরাতের অন্ধকারে কবন্ধ ছায়ামূর্তির রূপ ধরে ক্রেনের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে ?

—এবারে জীতেনবাবু বলুন, আপনি কি দেখেছিলেন ?

প্রৌঢ়, বহুদর্শী ট্যালিক্লার্ক জীতেন কুশারী বলল—দিন তারিখ পর্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে স্যার—

১৯৭৫ সালের ১১ই জানুয়ারি শনিবার। যে বিলেতী জাহাজ থেকে মাল আনলোডিং হবে এবং আমাকে তার হিসেব লিখতে হবে সেটা এসে হাজির হলো বড় অসময়ে। রাত দশটায়। কাজ শুরু করতে করতে রাত দুপুর। অগত্যা রাত্রিবাস করতে হলো। চার নম্বর শেডে একটা দোতলা বাড়ি আছে। তার নীচের তলাটা গোডাউন। ওপরে নাইট শিফটের ট্যালিক্লার্কদের রেস্টরুম। রাত দু'টো নাগাদ আমি এবং আমার 'কলিগ' আর এক ট্যালিক্লার্ক নিবারণ রেস্টরুমে এসে দু'জনে দু'টো খাটিয়া পেতে শুয়ে পড়লাম। আর একটু পরেই ঘুমিয়েও গেলাম। আগুন—আগুন—আগুন। দারুণ একটা চিৎকারে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। নিবারণ বলল, চলো ছাতে যাই দেখা যাক। ছাতে গিয়ে দেখলাম, দূরে গঙ্গার ধারে গার্ডেনরীচ জেটির নতুন ওয়ারহাউসে আগুন ধরেছে। আমি বললাম,—নিবারণ শীগগীর চলো দমকলে খবর দেওয়া যাক। ওখানে চায়ের পেটি আছে—পাটের বেল আছে—বলতে বলতেই হঠাৎ নিবারণের দিকে তাকিয়ে দেখি সে থর থর করে কাঁপছে। মুখের দু'পাশে গ্যাজলা উঠছে। চোখ দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। আমি দু'হাতে তার ঘাড় দু'টো ধরে প্রচণ্ড ঝাকুনি দিয়ে চিৎকার করে বললাম—কি হয়েছে নিবারণ, এরকম করছো কেন? গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে নিবারণ কোন রকমে হাত তুলে সেই জ্বলন্ত ওয়ারহাউসের পাশেই অন্ধকার গঙ্গার দিকে কি যেন ইঙ্গিত করল। সেদিকে তাকিয়েই হিম হয়ে গেল আমার বুকের রক্ত—

একটু থামল জীতেন কুশারী। তীব্র উত্তেজনায় তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। আস্তে আস্তে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, সেই দৃশ্যের কথা মনে হলে আজও ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দেয় স্যার—

—কি দেখেছিলেন জীতেনবাবু—শুধু তাই বলুন।

—পুড়ে যাওয়া গোডাউনের আগুনের আভায় আশপাশের যে জমাট অন্ধকারটা ফিকে হয়ে এসেছিল তার ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আর তার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচছে কতগুলো আগ্নেয় নারীমূর্তি। তাদের হাত পা, সারা শরীর যেন আগুন দিয়ে

গড়া। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। আর কে যেন আমার ঘাড় ধরে ছুটিয়ে নিয়ে গেল সেইদিকে। রেললাইনের স্লিপারে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছি, হ্যাণ্ডট্র্যাকে ধাক্কা খেয়ে পা-টা কেটে গেল। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—আমি ছুটছি তো ছুটছিই—কিন্তু যেই সেই ওয়ারহাউসের সামনে এসে দাঁড়ালাম অমনি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সেই আগুনের রাসলীলার বিচিত্র দৃশ্য। কোথায় সেই আগুন? সেই ওয়ারহাউসটা অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। তাব কোথাও আগুনেব চিহ্ন পর্যন্ত নেই। চারিদিকে নিশুতি রাতেব স্তব্ধতা থমথম করছে। আর রাশি রাশি তারা আর নক্ষত্রের ছায়া বুকে নিয়ে গঙ্গাব জল যেমন দোল খেয়ে চলেছিল ঠিক তেমনি দুলছে।

২

চাঁদনী রাতে বেলভেডিয়াবেব বুড়ো বটগাছের ডালে বসে থাকে এক বমণীর ছাযাদেহ।

দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে কলকাতা।

পুরানো বাড়িঘর ভেঙে বড় বড় ম্যানসন উঠছে। খানাখন্দ পুকুর ডোবা ভরিয়ে ফেলে চওড়া ডবল-ওয়ে রাস্তা বানানো হচ্ছে। আর নিওনের উগ্র সাদা আলোয় সেইসব অ্যাসফাল্টের ঝকঝকে রাস্তা ঝলমল করছে। কিন্তু—

'হণ্টেড হাউসেজ ইন ব্রিটেন' অর্থাৎ 'গ্রেটব্রিটেনের ভূতুড়ে বাড়ি'র লেখক প্রেততত্ত্ববিশারদ ম্যাকগ্রীগার বলেছেন—Dark and dilapidated houses are the favourite spot of phantoms—জীর্ণ পোড়ো বাড়ি প্রেতের প্রিয় আবাসস্থল। আধুনিক কালের শহর কলকাতায় পরিত্যক্ত পুরোনো বাড়ি বোধ হয় আঙুলে গোনা যায়। তাই ভূতুড়ে বাড়ির সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। তবু এখনও এই শহরে যে কয়টি

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সৌধ কালের ব্যবধানকে এড়িয়েও সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তার ভেতরে অন্যতম বোধ হয়—

বেলভেডিয়ার।

আলিপুরে লাটসাহেবের পুরানো বাড়ি। বর্তমানে এখানেই ন্যাশনাল লাইব্রেরি। প্রায় তিনশো বছরের পুরানো এই বাড়ির গায়ে পরম মমতার মত জড়ানো রয়েছে সাবেকদিনের অনেক রোমাঞ্চকর ইতিহাস। এই বাড়িতেই একদা বাস করতেন বহু সুকৃতি ও দুষ্কৃতির নায়ক বাংলার প্রথম গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁর আমলেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। তাঁর আমলেই মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি। ইংরেজদের আমোদ-আহ্লাদ, বিলাসিতা, বাবুগিরির চরম সেও তাঁরই রাজত্বকালে (১৭৭২-১৭৮৫)। শুধু আলিপুরের এই বিলাসগৃহ নয়, কার্জন বলে গেছেন, মোট তের বছরে তেরটা বাড়িতে বাস করেছেন তিনি। গঙ্গার ধারে সুখচরে, কাশীপুরে, রিষড়ায়, আলিপুরেই জজকোর্টের পাশে তাঁর প্রমোদ-গৃহে (এখন যেখানে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ) এবং আরও বহু জায়গায়। চৌরঙ্গী আর আলিপুরের জঙ্গলে হরিণ শিকারের যেমন নেশা ছিল হেস্টিংসের তেমনি ছিল নিত্যি নতুন জায়গায় বাড়ি তৈরি আর বিক্রির এক বিচিত্র খেয়াল। ফার্মিংজারের 'থ্যাকারস ক্যালকাটা ডিরেক্টরি'তেও আছে —'হি হ্যাড এ লুক্রেটিভ ম্যানিয়া ফর হাউস বিল্ডিং অ্যান্ড সেলিং'। এই ঐতিহাসিক উক্তি থেকেই বুঝতে পারা যায়, হেস্টিংস মানুষটা ছিলেন চঞ্চল, ছটফটে অর্থাৎ যাকে বলে 'ফ্যাস্টিডিয়াস'। খামখেয়ালী, বেপরোয়া উচ্ছৃংখল ইত্যাদি বিশেষণেও তাঁকে ভুষিত করেছেন তাঁর জীবনীকারেরা। এহেন হেস্টিংস সাহেবের অনেকগুলো শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কেটেছে এই বাড়িতে। তাঁর জীবনের অনেক উত্তেজনাময় রোমাঞ্চকর দিনের স্মৃতি বহন করছে এই বেলভেডিয়ারের বাড়ি। এই বাড়িতেই বড় বড় ভোজ-সভায়, খানাপিনায়, বল-নাচে হেস্টিংস এবং তাঁর বন্ধুদের সুরা-নারী-বিলাস উদ্দাম হয়ে উঠতো। এই ঐতিহাসিক বাড়িরই কোন দূর কোণে মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ফাঁসির চক্রান্ত ঘনীভুত হয়েছিল। আবার ব্যারন ইমহফ আর তাঁর স্ত্রী মেরিয়ান ইমহফ'কে কিছুকাল হেস্টিংস রেখেছিলেন (১৭৭৬) এই বাড়িতে; আর এইখানেই "ক্যালকাটা ওল্ড অ্যান্ড নিউ"-এর লেখক হেনরী কটনের ভাষায় 'কাল্টিভেটেড ইন্টিমেসি

উইথ মেরিয়ান' অর্থাৎ পরস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর অবৈধ প্রেম জমে উঠেছিল। হেস্টিংসের অনেক আনন্দ-বেদনা আর যন্ত্রণার মুহূর্ত আর তাঁর গভীর দীর্ঘশ্বাস মিশে রয়েছে বেলভেডিয়ারের বাতাসে। তাই হয়তো নিশি রাত্রে এই বিশাল বাড়ির সিঁড়িতে আজও তাঁর দ্রুত, অস্থির পায়ের শব্দ শোনা যায়।

আবার কখনো গভীর রাত্রির স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে ঘোড়ার খুরের শব্দ বেজে ওঠে খট্-খট্-খট্—যেন মনে হয় কোন অশ্বারোহী ঘন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। আর সেই খট্-খট্ শব্দ বেলভেডিয়ারের মাঠ পেরিয়ে, হর্টিকালচার গার্ডেন ছাড়িয়ে দূরে—বহুদূরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

লাইব্রেরির হেড-গার্ড এবং কেয়ার-টেকারের মুখে শোনা যায়, রিডিং রুমের (একদা বড়লাটদের বল-নাচের হল) শেষপ্রান্তে হঠাৎ বেজে ওঠে কনসার্টের শব্দ। আর সেই ঐকতানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইংরেজী গানের মধুর সুর চারিদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বিশাল রিডিং রুমের মেঝেতে জোড়া জোড়া পায়ের প্রচণ্ড শব্দে গোটা লাইব্রেরি-বাড়িটাই কাঁপতে থাকে। কিন্তু যেই হেড-গার্ড এবং নাইট-শিফটের দারোয়ানরা ছুটে যায় রিডিং হলের দিকে, অমনি থেমে যায় নাচ-গানের সেই উদ্দাম শব্দ। শুধু নিশুতি রাতের নিথর স্তব্ধতায় থমথম করে চারিদিক। ভয়ে আতংকে নাইট-গার্ডদের বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। দিনের আলোয় তারাই খৈনির টিপ মুখে গুঁজে দিতে দিতে পরস্পরের ভেতরে বলাবলি করে—লাটসাহেবকা কোঠী জিন পরীকা কোঠী হ্যায়—বেলভেডিয়ারের বাড়ি ভুতুড়ে বাড়ি।

শহর কলকাতায় এখনো যে কয়টি প্রেত-অধ্যুষিত বাড়ি আছে তার ভেতরে ন্যাশনাল লাইব্রেরির বাড়িটি যে ভুতের 'ফেবারিট স্পট' তা প্রমাণিত হয়ে যাবে এই ঘটনা থেকে। বিচিত্র এই ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী লাইব্রেরির এক অভিজ্ঞ দারোয়ান প্রতাপ সিং। প্রতাপের মুখে যেমন শুনেছিলাম, তেমনি এখানে বলছি—

তারিখটা ছিল ১৯১২ সালের ২রা জানুয়ারি।

সেদিন প্রতাপের ডিউটি পড়েছে লাইব্রেরির উত্তর দিকের (চিড়িয়াখানার

সামনে) গেটে—সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত্রি দু'টো পর্যন্ত তার ডিউটি। প্রত্যেক দারোয়ানকেই সাত ঘণ্টা করে ডিউটি করতে হয়। সেদিন এই নর্থ গেটে রাত দু'টোর সময় তাকে রিলিভ করতে আসবে ইন্দ্রদেও। ইন্দ্রদেওয়ের বয়স অল্প। চাকরিতে নতুন ঢুকেছে।

ঢং-ঢং—লাইব্রেরির পেটা ঘড়িতে দু'টো বাজল। প্রতাপ দূরে ঝিলের পাশে গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা গার্ডস কোয়ার্টারের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইল। ইন্দ্রদেও আসছে না কেন? কে জানে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আজকালকার ছেলেছোকরাদের দায়িত্ব বলতে কিছু নেই। কি আর করা যাবে! রিলিভার না আসা পর্যন্ত তার তো এখান থেকে নড়ার উপায় নেই!

মাঘ মাস। কনকনে বাতাস ঠাণ্ডা জলের ঝাপটার মত আছড়ে পড়ছে প্রতাপের চোখে-মুখে। ঠক ঠক করে কাঁপছে সে। আর ইন্দ্রদেওয়ের ওপরে অসহ্য রাগে জ্বলে যাচ্ছে।

ধু—ধুম্—লাইব্রেরির পিছনে ঝুরিনামা বটগাছটার কোটর থেকে একটা হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠল। এই প্যাঁচার ডাকটা নাকি ভালো নয়—লোকে বলে অমঙ্গল হয়। সে এসব মানে না। ঘন অন্ধকারে দৈত্যের মত ঝাপড়া বটগাছটার দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো লাইব্রেরির সাহেবরা বলে—এই বুড়ো অশ্বত্থগাছটা না কি লাটসাহেবদের আমলের। আর তার পাশেই সারি সারি শিরীষ সেগুন আর অর্জুন গাছ অন্ধকারে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে তাকালে তার গা কেমন ছম ছম করে। বুড়ো দিলবাহাদুরের কথা মনে পড়ে যায়। দিলবাহাদুর বলতো, এখানে নাকি 'জিন' আছে—জ্যোৎস্না রাত্রে কোনদিন শিরীষ গাছের মগডালে, আবার কোনদিন বটগাছের নীচের যে ডালটায় বেলভেডিয়ারের কোয়ার্টারের ছোট ছোট ছেলেরা দোল খায় সেখানে নাকি পা ঝুলিয়ে বসে থাকে সেই জিন। চাঁদের আলোর মতই সাদা ধবধবে তার গায়ের রঙ। আর এত লম্বা সেই মেমসাহেব যে বটগাছের নীচের ডালে বসে আছে—কিন্তু তার মাথাটা ঠেকে গিয়েছে অনেক অনেক উঁচুতে ওপরের ডালে। তার পরনে সাদা ধবধবে গাউন থেকে জ্যোৎস্নার আলো যেন ঠিকরে পড়ছে। দিল-বাহাদুরের কথা কেউ বিশ্বাস করতো, কেউ করতো না। অনেকে ঠাট্টা করে বলতো, ইদানীং দিলবাহাদুরের গাঁজার মাত্রাটা খুব বেড়ে গিয়েছে—

কিন্তু বাবা—যত ঠাট্টা-তামাশাই করো রাত দুপুরে এসব কথা মনে হলে—

ভয় ? না-না, ভয়টয় তার কোনকালেই নেই। সে লড়াইফেরত মানুষ। চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় সে কতবার বমডিলায়, রঙিয়ায়, বঙ্গাইগাঁওতে কবরখানার পাশে সারারাত বন্দুক ঘাড়ে করে পাহারা দিয়েছে। কোনদিন —কখনো মুহূর্তের জন্যেও মনের কোন কোণে এতটুকু ভয় উঁকি দেয় নি। তবুও—তবুও কেন যেন এই নর্থ গেটে নাইট ডিউটি পড়লেই তার কেমন অস্বস্তি হয়। উত্তরদিকের গেট পেরোলেই চওড়া ঝকঝকে পীচের রাস্তা চিড়িয়াখানার সামনে দিয়ে টালি-নালার ওপরে আলিপুর ব্রীজ পেরিয়ে চলে গিয়েছে সোজা রেসকোর্সের দিকে। এই গেট, ওই রাস্তা আর ওই পুলটাকে জড়িয়েই যে কত রকম কথা শোনা যায়—

এই নর্থ গেটটাই না কি ছিল লাটসাহেবের এই বাড়ির সদর দেউড়ি। বেলভেডিয়ার থেকে পালকি চেপে এই দরজা দিয়েই সাহেবরা চলে যেত গড়ের মাঠ পেরিয়ে শহরের দিকে। এখনও এক-একদিন রাত্রে এই গেটে একটা পালকির ছায়া না কি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। এই গেটে পাহারা দিতে দিতেই তো একদিন রাত্রে বীরবাহাদুর প্রায় অক্কা পেতে বসেছিল।

সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। নিজের হাতটা পর্যন্ত ভালো করে দেখা যায় না। হঠাৎ বীরবাহাদুরের কানে এল— হিপ্পোলো হুকুম্মা—হিপ্পোলো হুকুম্মা—পালকিবাহকদের সেই একটানা স্বরটা যেন লাইব্রেরির বাড়ির দিক থেকে উত্তরদিকের গেটে এগিয়ে আসতে লাগল। ক্রমশঃ এগিয়ে এল পালকি। বীরবাহাদুর দেখল—পালকির দরজাটা হাট করে খোলা। আর তার ভেতরে লম্বা ঢ্যাঙা চেহারার এক সাহেব দারুণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তার সারা মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তার বাঁদিকের ঘাড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! দারুণ ভয় পেয়ে যেই চিৎকার করে বীরবাহাদুর পূর্বদিকের (জেলখানার দিকে) গেটের দারোয়ান জালিম শেখকে ডাকল অমনি চোখের পলকে মিলিয়ে গেল সেই জখমী সাহেবের পালকি !

আবার ওই আলিপুরের পুলের নীচে আদিগঙ্গার পাড়ে নাকি

জিনদের আনাগোনা করতে দেখা যায়। তারা জলে নামে। স্নান করে। কাপড় কাচে। সেই জলে নামার শব্দ—কাপড় কাচার আওয়াজ দূরে থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। কিন্তু যেই তাদের কাছে যাওয়া যাবে অমনি কোথায় যে মিলিয়ে যায় তারা! শুধু নজরে পড়বে গঙ্গার পাড়ে ভুট্টাক্ষেতের জঙ্গলের পাশে সাধুজীর ডেরায় আলো জ্বলছে। কোনদিন আবার দেখা যায়, একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে আসে এক গোরা সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে জলে ছপ ছপ শব্দ তুলে কোথা থেকে আসে একটা ডিঙি নৌকো। সাহেব সেই নৌকোয় খেয়া পার হয়ে লাটসাহেবের বাড়ির দিকে চলে যায়—

—প্রতাপ, তুমি কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলছো। তুমি নিজে কি দেখেছো তা বলছো না।

—বলছি—বলছি স্যার, প্রতাপ সিং সেই বটগাছটার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, বারো বরষ লাইব্রেরির এই নোকরি হয়ে গেল। এখানে জয়েন করার পর থেকে জিন-পরীদের নিয়ে কত কথা শুনেছি স্যার—আমি কখনো বিশোয়াস করিনি—লেকিন সেই রাত্রে স্যার—

ইন্দ্রদেও আসছে না দেখে প্রতাপ যেই লাঠিটা বগলে নিয়ে গার্ডস কোয়ার্টারের দিকে কয়েক পা এগিয়েছে অমনি তার কানে এল একটা দারুণ চিৎকার—প্র-তা-প—ভা-ই-য়া—আ-আ-হা—রাম—আর শেষের দিকে কোঁৎ করে একটা শব্দ হলো। মনে হলো—কে যেন শক্ত হাতে তার গলাটা টিপে ধরল। কিন্তু এ তো পরিষ্কার ইন্দ্রদেওয়ের গলা। সাপ-টাপে কাটল নাকি। প্রতাপও গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল—এই যে ইন্দ্র-দেও—আ-মি-এখানে-এ-এ—। কিন্তু—

কোথায় ইন্দ্রদেও? তার কোন সাড়াশব্দ নেই। শুধু গাছে গাছে হু হু বাতাসের গর্জন শোনা যাচ্ছে। যেদিক থেকে ইন্দ্রদেওয়ের চিৎকারটা শোনা গিয়েছিল সেদিকে এগিয়ে যেতেই ঝাপড়া সেই শিরীষ গাছটির নীচে রীডারদের জন্যে যে সিমেণ্ট বাঁধানো বেদী আছে সেখানে কে যেন শুয়ে রয়েছে মনে হলো। হেঁকে বলল প্রতাপ—কে ওখানে—কে? কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সামনে গিয়ে দেখল ইন্দ্রদেও মাটিতে

শুয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করছে। তার মুখের দু'পাশ দিয়ে গ্যাঁজলা গড়িয়ে পড়ছে

—কি-কি হয়েছে ইন্দ্রদেও—তোর কি মৃগীর ব্যামো—

কোন কথা বলতে পারল না ইন্দ্রদেও। শুধু তার পাশে পড়ে-থাকা লাঠিটা উঁচিয়ে কোন রকমে ইঙ্গিত করল সেই ঝুরি-নামা ঝাপড়া বটগাছটার দিকে। সেদিকে তাকাতেই থমকে দাঁড়ালো প্রতাপের হৃৎস্পন্দন। অশ্বত্থ গাছ—সেই লাটসাহেবের আমলের অশ্বত্থ গাছটার নীচে পা ঝুলিয়ে বসে আছে সেই ফটফটে সাদা গাউন-পরা মেমসাহেব! তার মাথাটা ওপরের ডালে গিয়ে ঠেকেছে। প্রতাপ তার লাঠিটা তুলে তাকে তাড়াতে চাইল। কিন্তু পারল না। হাত দু'টো যেন অবশ হয়ে গিয়েছে! চেষ্টা করল চিৎকার করে ডাকতে মেন গেটের দারোয়ানকে। কিন্তু গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। আর একটু হলেই তার অবস্থাটাও ইন্দ্রদেও'এর মতই হতো। তার মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছিল। মনে হচ্ছিল, টলে পড়ে যাবে—এমন সময় ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং—সাইকেলে চেপে রাউন্ড দিতে এল কেয়ার-টেকার ব্যানার্জীবাবু। প্রতাপ সব বৃত্তান্ত বলল। ইন্দ্রদেওয়ের ওই অবস্থা দেখে ব্যানার্জী কিন্তু অন্যান্য দিনের মত হেসে উড়িয়ে দিতে পারল না। সে লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা রিপোর্ট করল। সেই থেকে রাত্রে নর্থ গেটে দু'জন করে দারোয়ান থাকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, মাদ্রিদ প্রভৃতি পৃথিবীর বড় বড় শহরের 'গোস্ট হন্টেড হাউস' সম্বন্ধে দীর্ঘদিন গবেষণা করে ইটালির সুবিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিশারদ ডক্টর সিজার লোমব্রোসা বলেছেন, There is no smoke without fire. আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না। অর্থাৎ প্রেত-অধ্যুষিত বাড়ি সম্বন্ধে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই এক কথাই বলতে চেয়েছেন—হয় খুন না হয় আত্মহত্যা বা কোন অপঘাত মৃত্যু হয় যে বাড়িতে সেই বাড়িতেই প্রেতের আনাগোনা দেখা যায়। মৃত ব্যক্তির অশরীরী আত্মা তার সদ্গতির আশায় উন্মুখ হয়ে তার পুরানো জায়গায় আসে।

বেশ কয়েকটি খুনজখমের রোমাঞ্চকর ঘটনা আছে বেলভেডিয়ারের বাড়ির পুরানো ইতিহাসে। প্রায় দুইশো বছর আগে দুই ইংরেজ

রাজপুরুষ দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা ডুয়েলে মেতে উঠেছিল এই বাড়িরই বাগানের পশ্চিম দিকে।

ওয়ারেন হেস্টিংস।

ফিলিপ ফ্রান্সিস।

একজন বাংলার দণ্ডমুণ্ডের মালিক অর্থাৎ বড়লাট আর একজন তারই লাটসভার বিশিষ্ট সদস্য। দু'জনের ভেতরে এতটুকু বনিবনা ছিল না। কেউ বলে তাদের মন কষাকষি হয়েছিল মারাঠা যুদ্ধের (তখন ইংরেজদের সঙ্গে মারাঠাদের ঝগড়া চলছিল) নীতি নিয়ে, আবার কেউ বলে—পৃথিবীর বহু দুর্ঘটনার আড়ালে যেমন থাকে অঘটনঘটনপটিয়সী কোন রমণী তেমনি এখানেও ছিল এক অপরূপ রূপসী। ডুয়েলের মূল কারণ যে শ্বেতাঙ্গিনী এক নীলনয়না তা আভাসে বলেছেন বাস্তিদ তাঁর বই 'ইকোজ ফ্রম ওল্ড ক্যালকাটা'য়—European women are few, jealousy often gave rise to duel. এই ডুয়েলের সাক্ষী ছিল দু'জন—হেস্টিংসের সহকারী লেফটেন্যান্ট কর্নেল পিয়ার্স আর ফিলিপ ফ্র্যান্সিসের বন্ধু কোম্পানির এঞ্জিনীয়ার ওয়াটসন। এবারে পিয়ার্সের জবানীতে শুনুন সেই ডুয়েলের বিবরণ—

১৭ই আগস্ট ১৭৮০।

সকাল ঠিক ছয়টার সময় হেস্টিংস সাহেবকে নিয়ে আমি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে হাজির হলাম। আমরা দেখলাম ওয়াটসন এবং মি. ফ্রান্সিস আগেই এসে গিয়েছেন। আলিপুর রোডের পাশেই বেলভেডিয়ারের বাগানের পশ্চিম দিকে গাছগাছালির নীচে (এখন এখানেই ঘনসন্নিবদ্ধ শিরীষের ছায়াবীথি) দাঁড়ালেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। ডুয়েলের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে তাঁরা কেউই ওয়াকিবহাল ছিলেন না। কে কতটা দূরে দাঁড়াবেন—সেই স্পেস'টা মেপে দিলেন ওয়াটসন। এবং দু'জনকে একই সংগে গুলী ছুঁড়তে বললেন। ফ্রান্সিস হেস্টিংসকে লক্ষ্য করে যেই গুলী করল অমনি ভস্ করে একটা শব্দ হলো শুধু আর খানিকটা ধোঁয়া বের হলো। টোটাটা ড্যাম্প হয়ে গিয়েছিল। হেস্টিংস তাকে আর একটা চান্স দিলেন। কিন্তু তাঁর গুলী হেস্টিংসের কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রায় সংগে সংগেই অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুটে এল হেস্টিংসের গুলি। ফ্রান্সিসের ডান দিকের ঘাড়ে এসে লাগল গুলি। ফ্রান্সিস আর্তনাদ করে বলল—উঃ, মরে গেছি—মরে গেছি!

—হা ভগবান, এতখানি হবে তা তো ভাবিনি, বলেই হেস্টিংসও ছুটে গেলেন তার দিকে। ছুটে এলো ওয়াটসন। আমি ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করার জন্য সাদা কাপড় আনতে এবং চাকরবাকরদের ডাকতে গেলাম বেলভেডিয়ারে। দুই মিনিট পরে ফিরে এসে দেখি ওয়াটসন গিয়েছেন পালকি কিম্বা একটা গাড়ি আনতে। আর হেস্টিংস আহত ফ্রান্সিসকে বলছেন, আপনি ভয় পাবেন না। আঘাত গুরুতর নয়—আপনি অনুগ্রহ করে আমার বেলভেডিয়ারের বাড়িতে চলুন।

ক্ষুব্ধ হয়ে ফ্রান্সিস বললেন, আপনার বাড়িতে আমি যাবো না।

পালকি এল। সমস্ত পিঠজুড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ফ্রান্সিসকে পালকিতে তুলে দেওয়া হলো, কিন্তু শহরে যাওয়া গেল না। আদি গঙ্গা পার হওয়া সম্ভব হলো না। জোয়ারে দু'কূল ছাপিয়ে উঠেছে। অগত্যা ফ্রান্সিসকে বেলভেডিয়ারেই ফিরে আসতে হলো।

হেনরী কটনের 'Calcutta Old and New' বইটিতে আছে—ফ্রান্সিসকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পালকি করে যেতে দেখেছিলেন এক মহিলা —Mrs. Ellerton seeing Francis, all bloody from duel in a palanquin,…

মিসেস এলারটন সে-যুগের এক বিদুষী ইংরেজ মহিলা। তাঁর বাড়িতে শ্রীরামপুরের বিখ্যাত উইলিয়ম কেরীর যাতায়াত ছিল। তাঁর বাড়িটা ছিল বেলভেডিয়ারের নর্থ গেটের বাইরে রাস্তার ডানদিকে (এখন যেখানে পেট্রোল পাম্প)।

আহত ফ্রান্সিসকে বহন করে যে পালকি দু'শো বছর আগে উত্তর দিকের গেট পেরিয়ে চলে গিয়েছিল সেই পালকির ছায়াই কি লাইব্রেরির দারোয়ানদের চোখের সামনে চকিতে দেখা দিয়েই নিশুতি রাতের গভীর অন্ধকারে মিলিয়ে যায়? সে-কথা কে বলবে!

কিন্তু কোন রূপসীকে নিয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই বেধেছিল? ইংরেজদের সেই ন্যক্কারজনক বৃত্তান্ত নিজেরাই লিখে গিয়েছে—

ম্যাডাম গ্র্যাণ্ড।

হেস্টিংস-ফ্রান্সিস-বারওয়েলের যুগের কলকাতার মক্ষিরানী ছিল মিসেস গ্র্যাণ্ড। তার অসাধারণ রূপের বর্ণনা আছে বাস্তিদের বইতে—

কলকাতার সেরা সুন্দরী সে। দীর্ঘাঙ্গী। পরীর মত অঙ্গসৌষ্ঠব। তুষারের মত সাদা তার গায়ের রঙ। ঘন কালো ভ্রূর নীচে বড় বড় দ্'টো নীলাভ চোখ। তার অপর্যাপ্ত সোনালী চুল রূপকথার পরমাসুন্দরী রানীদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

এহেন রূপসী মেয়েকে ফ্রান্সিস গ্র্যাণ্ড নামে কোম্পানির এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী যেই বিয়ে করে নিয়ে এসে বেলভেডিয়ারের কাছেই আলিপুর লেনের রেড গার্ডেন হাউসে তুলল অমনি তরুণ হেস্টিংস-ফ্রান্সিস-বারওয়েল প্রমুখদের মনের ভেতরে আলোড়ন উঠল। হেস্টিংস তো প্রথম আলাপেই গ্র্যাণ্ডদম্পতিকে বেলভেডিয়ারের বাড়িতে ডিনারে নিমন্ত্রণ করে বসলেন। সেখানে সেইদিন (২৩শে নভেম্বর ১৭৭৮) বল-নাচের আসরে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল ফিলিপ ফ্রান্সিসের। প্রথম দৃষ্টিতেই উন্মাদের মত প্রেমে পড়েছিল ফ্রান্সিস। ঠিক তার পনের দিন পরেই ঘটে গিয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর সাতের দশকের কলকাতার সবচেয়ে ন্যক্কারজনক এবং চাঞ্চল্যকর সেই ঘটনা—

৭ই ডিসেম্বর ১৭৭৮। রাত্রি নেমেছিল গভীর হয়ে। ঘন কুয়াশা আর অন্ধকারে চারিদিক যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় রেড গার্ডেন হাউসের উঁচু পাচিলের পাশে নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়ালো একটা ছায়ামূর্তি। তার ঘাড়ে একটা মই। সেই মই বেয়ে পাচিল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল রহস্যময় সেই কালো ছায়াদেহ। সোজা চলে এল ফরাসী সুন্দরী ম্যাডাম গ্র্যাণ্ডের ঘরে। মি গ্র্যাণ্ড বাড়িতে ছিলেন না। তিনি খিদিরপুরে বারওয়েল সাহেবের কুঠিতে ডিনার পার্টিতে গিয়েছিলেন। মি. গ্র্যাণ্ড যখন শ্যাম্পেনে চুমুক দিয়ে রূপসী স্ত্রীর স্বপ্নসুখে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন ঠিক সেই সময় তার বাড়ির জমাদার দৌড়ে এসে খবর দিল—মেমসাহেবের ঘরে কাউন্সিলার সাহেব ফিলিপ ফ্রান্সিস ধরা পড়েছে। জমাদার আরো বলল, আগেও কয়েক রাত্রি ওই সাহেব এসেছিল—সে ধরতে পারে নি—আজ হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে তার ঘরে সাহেবকে বন্দী করে রেখেছে। খুন চেপে গেল গ্র্যাণ্ডের মাথায়। হেস্টিংসের মিলিটারি সেক্রেটারি মেজর পামার এবং দু'একজন বন্ধুবান্ধব ও পিস্তল লাঠি তলোয়ার নিয়ে গ্র্যাণ্ড সাহেব এলেন তাঁর কুঠিতে। কিন্তু নাগরকে যে ঘরে আটকে রাখা হয়েছে সেই ঘরের তালা খুলতেই তাদের

ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ঘন অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলেন মাননীয় কাউন্সিলার সাহেব।

ফিলিপ ফ্রান্সিসের এই দুঃসাহসিক রোমান্সের ঘটনাটি প্রসঙ্গে সাংবাদিক হিকিসাহেব (১৭৭৭-১৮০৮) তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন—কলকাতার অভিজাত ইংরেজদের মাথা একেবারে হেঁট করে দিয়েছিল এই কেলেংকারি। এই কারণেও হেস্টিংসের আক্রোশ হতে পারে ফ্রান্সিসের ওপর। আব ম্যাডাম গ্র্যান্ডের ওপর হেস্টিংসেরও দুর্বলতা যে ছিল তার ঐতিহাসিক নজিরও আছে—বেলভেডিয়ারে 'পার্টি' দেওয়ার দুই দিন পরে (২৫শে নভেম্বর ১৭৭৮) চুঁচুড়া এবং সুখচরে মিসেস গ্র্যান্ড আর হেস্টিংসকে গঙ্গার বুকে নৌকোবিহার করতে দেখা গিয়েছিল।* অতএব প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাওয়ার মানসিক যন্ত্রণার ফলশ্রুতি সেই ঐতিহাসিক 'ডুয়েল' হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

একদা ওসমান আর জগৎসিংহ বেলভেডিয়ারের যে ঘনসন্নিবদ্ধ তরু-শ্রেণীর নীচে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল সেখানে নিশুতি রাতের গভীর অন্ধকারে আয়েশা আসতে পারে বৈ কি!

লোমব্রোসার থিয়োরি অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে—বেলভেডিয়ার হাউসে অর্থাৎ আধুনিক কালের ন্যাশনাল লাইব্রেরির বাড়ির ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা বা ধোয়াটে প্রত্যেকটি ঘটনার আড়ালেই ঐতিহাসিক সত্যের ফুলকি আছে।

রেভারেণ্ড লঙ সাহেব বলেছেন, শহর বা 'টাউন' থেকে হেস্টিংস তাঁর বাগানবাড়ি বেলভেডিয়ারে যেতে হলে সাধারণত আদিগঙ্গা পর্যন্ত আসতেন সাদা ঘোড়ায় চড়ে আর খাল পার হতেন ডিঙি নৌকোয়। খুবই অসুবিধা হতো পার হতে বলে তিনি কোম্পানির কাছে একটা ব্রীজ তৈরির অনুমতি চাইছেন (২০শে জুন ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ)। গভর্নমেন্ট রেকর্ডসের ভিত্তিতে† লঙের এই তথ্যটুকুর ভেতরে লাইব্রেরির নর্থ গেটের নাইট-গার্ডদের দেখা সেই সাদা ঘোড়ায় চড়ে গোরা সাহেবের আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

*Echoes from old Calcutta—Blosteed দ্রষ্টব্য

† Selections from Unpublished Records of Government, 1748-1767. Rev. J. Long.

চাঁদনী রাত্রে আলিপুর ব্রীজের নীচে আদিগঙ্গায় স্নান করে যে অশরীরী ছায়ারা তাদের কথা লিখেছেন আর এক সাহেব+। বেলভেডিয়ারের আশেপাশে সারা আলিপুর জুড়ে ছিল গভীর জঙ্গল। এখানে ছিল চোর-ডাকাতদের আড্ডা। ডাকাতের দল পথিকদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের খুন করে লাশ ফেলে দিত খালের জলে। লোকে মনে করে তাদেরই বিদেহী আত্মা এখানে আসে!

লাইব্রেরির ভেতরে বিডিং রুমে এবং দোতলার করিডরে যে অস্থির পদধ্বনি শোনা যায়—কখনো কখনো 'নিউবুক ডিসপ্লে' হলের বাঁদিকের প্যাসেজে যে রহস্যময় ছায়াদেহ দেখা দিয়েই অন্ধকারে মিলিয়ে যায় তারও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে—স্পিরিচুয়্যালিস্ট ডক্টর নানডর ফডর—হেড অফ দি ইণ্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল সায়েন্স—বলেছেন—কেউ গভীর অনুশোচনা অথবা মানসিক যন্ত্রণায় পীড়িত হয়ে কোন বাড়িতে বাস করে যদি পরে অন্য কোথাও মারা যায় তাহলেও—Living inhabitants of that house see the phantom of that self-tortured dead man.—অর্থাৎ জীবন্ত অধিবাসীরা অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত মৃত মানুষটার অশরীরী ছায়া দেখতে পায়!

এই বেলভেডিয়ারের বাড়িতে কে এবং কেন তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় বহু বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেছিল, সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

বেলভেডিয়ার—ভূতুড়ে বাড়ি। লাইব্রেরির চাকরিতে আসার পর থেকেই এই কথাটা শুনে আসছি। ভূত-প্রেতে কোন বিশ্বাস আমার ছিল না। কিন্তু নিজের চোখে যে বিচিত্র ব্যাপারটা দেখেছিলাম আজ পর্যন্ত তা ভাবলে শিউরে ওঠে সারা শরীর।

সেদিন ছিল 'ইভনিং ডিউটি' অর্থাৎ বেলা একটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত। লাইব্রেরির নিয়ম হলো, বিশাল বাড়ি এবং অনেকগুলো জানালা দরজা বলে দু'জন দারোয়ান ৭টা থেকে সেগুলো বন্ধ করতে আরম্ভ করে। হেডগার্ড আটটা বাজার কিছু আগে দোতলা থেকে প্রত্যেকটি ঘরের দরজা-জানালা চেক করতে করতে নীচে নেমে আসে।

+Recollections of Calcutta Massey.

আটটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি আছে। রিডিং-কাউণ্টারের কাজ শেষ। আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি বেরোতে যাবো এমন সময় দোতলায় কে যেন দারুণ আর্তনাদ করে উঠল। চমকে উঠলাম। হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে নেমে এল হেডগার্ড কর্ণবাহাদুর থাপা। বলল—স্যার শীগগীর চলুন তো ওপরে!

—কেন—কি হয়েছে?

—লিফট বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই পাঁচটায়। তার স্টার্টারের চাবিও গেটে জমা আছে। কিন্তু—স্যার লিফট ওপরে উঠে আসছে—

—কী বলছো তুমি—চলো তো দেখি!

দোতালায় গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর মনে হলো—মনে হলো যেন হিমশীতল জলের স্রোত বয়ে চলেছে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে বেয়ে। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আলোকোজ্জ্বল লিফট ধীর গতিতে একবার নীচে নেমে যাচ্ছে আবার ওপরে উঠে আসছে।

ইতিহাসে* আছে ১৭৬৯ থেকে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ, এই সাত বছর ব্যারন ইমহফ এবং তাঁর স্ত্রী নীলনয়না সুন্দরী মেরিয়ান ইমহফকে বেলভেডিয়ারের বাড়িতে রেখেছিলেন হেস্টিংস। ইমহফ দম্পতির দুই ছেলে চার্লস আর জুলিয়াসও ছিল এখানে। ব্যারন খুব ভাল করেই জানতেন—তাঁর স্ত্রীর হেস্টিংসের ওপর দুর্বলতার কথা। হেস্টিংস ব্যারনকে কোম্পানির কাজে মাদ্রাজ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কিম্বা ব্যারন নিজেই মনের দুঃখে স্ত্রীর কাছে থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন তা জানা যায় না। এই সময় গভীর রাত্রে দোতলায় মেরিয়ানের ঘরে গোপনে অভিসারে যেতেন হেস্টিংস।

আরও একটি ঐতিহাসিক ভুতুড়ে বাড়ি আছে এই আলিপুরেই।

এই বাড়িটির ইতিবৃত্ত লেখা আছে পুরানো কলকাতার ইতিহাসে, আছে সরকারী নথিপত্রে—**For Calcutta tradition connects the 'House' with a famous ghost.**[১]—এই প্রেতমূর্তি কেমন করে

*** Warren Hastings : A Biography. Trotter Lionel J., P. 162.**

1. Calcutta Old and New. Henry Cotton—P. 982

আসে, কি করে, তারও বিবরণ আছে ইংরেজ ঐতিহাসিকের লেখা সুবিখ্যাত গ্রন্থে [২]—

ইতিহাসের বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী এই সুদৃশ্য বাড়িটির চারিদিকের ফাঁকা মাঠে যখন গভীর রাত্রির স্তব্ধতা থমথম করে, তখন চারিদিকের তরল অন্ধকারে একটুকরো ঘন কালো ছায়ার মত এগিয়ে আসে চারফুকারের (চার ঘোড়ার) একটা ব্রুহাম গাড়ি। গাড়ি এসে থামে বাড়ির সামনে। সংগে সংগে অস্থির হয়ে নেমে আসে সেই প্রেতচ্ছায়া। বাড়ির আশেপাশে ফার্নবীথির ঝোপে, মাধবীলতার কুঞ্জে ঝুঁকে পড়ে সে কি যেন খোঁজে।

রাত বাড়ে।

রাত্রির বাতাসে স্নান করে তারাগুলো আশ্চর্যরকমের উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর সেই তারার আলো ফিকে জ্যোৎস্নার ছায়ার মত গাছগাছালি-ঘেরা বিশাল মাঠটিকে স্পষ্ট করে তোলে। সেই ছায়াদেহ যেন একটা নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে একবার যায় ইউক্যালিপটাস গাছটার নীচে, আবার ছুটে যায় শালবীথির অন্ধকারে। কোথাও সে পায় না তার হারানো জিনিস!

এইবার সে আরও অস্থির, আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সশব্দে আর দ্রুত পদক্ষেপে সে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে আসে সেই বাড়ির দোতলায়। বড় হল-ঘরটায় এসে সে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হয়তো দু'শো বছরের ওপার থেকে সাবেক দিনের কত মধুর স্মৃতি ভিড় করে আসে তার মনে। তন্বী সুন্দরী তার সেই প্রিয়তমার কবোষ্ণ সান্নিধ্যের ছন্দোসুরভিত দিনগুলোর স্মৃতির অনুরণন তার রক্তের ভেতরে মৃদংগের মত বাজতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ সে সজাগ হয়ে ওঠে তার হারিয়ে যাওয়া অমূল্য সেই জিনিসগুলো সম্বন্ধে। সংগে সংগে সে যেন তীব্র একটা জ্বালায় জ্বলে ওঠে। বদ্ধ একটা উন্মাদের মত সে আলমারিতে, দেরাজের প্রত্যেকটি ড্রয়ারে, বিছানার নীচে সে খুঁজতে থাকে। পায় না সেই জিনিসগুলো। দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে সে মনে করতে চেষ্টা করে কোথায় —কোথায় রেখেছিল--কোথায় রেখেছিল—কোথায় রাখতে পারে সেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো। সে ছুটে যায় স্নান-ঘরে। সেখানে

2. British Government in India. Vol. I., Lord Curzon.

তন্ন তন্ন করে খোঁজে। নাঃ, সেখানেও নেই। আসে পিছনের ঘোরানো কাঠের সিঁড়িতে। এবারে একটু অবাক হয়। দু'শো বছরের বর্ষার জলে, গ্রীষ্মের খর রোদেও সিঁড়িটা এতটুকু জীর্ণ হয় নি। সেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামে। আবার কিছুক্ষণ এখানে-সেখানে খুঁজে ব্যর্থ আর হতাশ হয়ে সে ক্লান্ত পায়ে সেই চারঘোড়ারের ব্রুহাম গাড়িতে ওঠে। ফিকে অন্ধকারে একটা ছায়ার মতই অদৃশ্য হয়ে যায় গাড়িটা। কিন্তু—

কার এই প্রেতচ্ছায়া ?

কোন ঐতিহাসিক বাড়ি ?

সেসব জানতে হলে যেতে হবে—যেতে হবে অনেক—অনেক দিন আগে সেই সুদূর অতীতে—দু'শো বছর আগে।

১৭৭৭ সন।

সেকালের কলকাতার মহানায়ক গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। ঐতিহাসিক হেনরী কটন বলেন—এই প্রেতমূর্তি যে নিশিরাত্রে আকুল হয়ে তার হারিয়ে-যাওয়া জিনিস খুঁজতে আসে—সে আর কেউ নয়—

স্বয়ং বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস। আর বাড়িটা—জজ কোর্টের পাশে হেস্টিংস হাউস। আধুনিককালে এখানে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ।

ইতিহাসে আছে, This Hasting's House was built around 1777. তার আগের বছর কোনো সময় জঙ্গলাকীর্ণ এই জমিটা কিনে হেস্টিংস মনের মত করে এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন। আর এই বছরই নতুন বাড়িতে নতুন ঘরনী মেরিয়ান ইমহফ'কে নিয়ে এসেছিলেন। এই সময় তাঁর বেলভেডিয়ারের বিশাল প্রাসাদটি তাঁর অতিথি এবং বন্ধু-বান্ধবদের জন্য ব্যবহৃত হতো।

হেস্টিংস হাউস।

এই সুদৃশ্য বাড়িতে কতবার এসেছেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এলিজা ইম্পে ; এসেছেন কাউন্সিলার ফিলিপ ফ্রান্সিসের সেক্রেটারি এবং শ্যালক ম্যাক্রাবি ; এসেছেন সেনাবিভাগের অধিনায়ক কর্নেল মনসন—আরও কত সুবিখ্যাত রাজপুরুষের পদধূলিরঞ্জিত এই বাড়ি। সেকালে শহর থেকে দূরে আরণ্যক পরিবেশে এই প্রাসাদের সৌন্দর্যের কথা হেস্টিংসের বন্ধুদের মুখে মুখে ফিরতো—ম্যাক্রাবি একটা চিঠিতে

লিখেছেন—জ্যোৎস্নাভরা চাঁদিনী রাত্রে সাদা ধবধবে এই বাড়িটির আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য রীতিমত চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

১৭৭৭ থেকে ১৭৮৪ পর্যন্ত মাত্র সাত বছর হেস্টিংস ও মেরিয়ান এই বাড়িতে বাস করেছিলেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে মিসেস হেস্টিংস দেশে চলে যান। তার পরের বছর এখানকার পাট চুকিয়ে হেস্টিংস সাহেবও ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দেন এবং দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর পরে (১৮১৮ সালে) পরিণত বয়সে (৮৬ বছর) তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। ডেলসফোর্ড চার্চের ঘনসন্নিবদ্ধ পপলারের ছায়াবীথির নীচে তাঁকে মহাসমারোহে সমাধিও দেওয়া হয়েছিল। তাহলে কিসের অতৃপ্তি নিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর বিদেহী আত্মা বাংলাদেশে তাঁর প্রিয় আবাসভূমিতে আসে—কি খোঁজে সে এখানে ?

কি খোঁজে হেস্টিংসের প্রেতাত্মা ?

হেনরী কটন তাঁর 'ক্যালকাটা ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ' বইতে বলেছেন—হেস্টিংস তাঁর হারিয়ে-যাওয়া কতকগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজতে আসেন—আর সেই দরকারী বস্তুগুলোর খবর পাওয়া যায়—হেস্টিংসের লেখা তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি মি. নেসবিট টমসনের কাছে একটা চিঠিতে—"তোমরা আমার সেই হারিয়ে-যাওয়া জিনিসগুলো আজও উদ্ধার করতে পারলে না। আমার সেই কালো কাঠের বাক্সের—গোপনীয় কাগজপত্রগুলোর জন্য কী মানসিক যন্ত্রণাতেই যে দিন কাটাচ্ছি"···টমসন চেষ্টা করেছিলেন সেই জিনিসগুলোর হদিস করতে। তাই ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৭ সালের ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—"এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে প্রাক্তন বড়লাট বাহাদুর ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলাদেশ হইতে চলিয়া আসার সময় তাঁর চৌরঙ্গীর বাড়ি কিংবা আলিপুরে তাঁর নূতন বাড়ি হইতে একটা কালো কাঠের বাক্স হয় চুরি না হয় ভুলক্রমে নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। এই বাক্সের ভিতরে ছিল দুইটি ছবি এবং তাঁর ব্যক্তিগত অত্যন্ত জরুরী কতকগুলি কাগজপত্র। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই জিনিসগুলির সন্ধান দিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে মি. লারকিনস (হেস্টিংসের বন্ধু) এবং মি টমসন দুই হাজার সিক্কা টাকা দিয়া পুরস্কৃত করিবেন"—

কিন্তু এত চেষ্টা করেও কিছুই হয়নি। পাওয়া যায়নি সেই রহস্যময় কালো কাঠের বাক্স।

১৯০১ সালে বড়লাট কার্জন হেস্টিংস হাউসটিকে কিনে নিয়ে তাকে সরকারী অতিথি-ভবন অর্থাৎ স্টেট গেস্ট হাউস করেছিলেন। তিনিও এই বাড়িতে ভূতের আনাগোনার কথা উল্লেখ করেছেন।

হেস্টিংস হাউসে ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা দুই রকম ভাবে হয়। কখনো কখনো বিকেলের রোদ যখন বাঁকা হয়ে পড়ে চারিদিকে তখন দেখা যায় সাবেক আমলের একটা ঘোড়ার গাড়ি ধীর গতিতে এগিয়ে যায় হেস্টিংস হাউসের দিকে। গাড়ির কোচম্যানের পরনে জমকালো পোশাক। সে গাড়িটিকে নিয়ে বাড়ির গাড়ি-বারান্দার নীচে এসেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

আর এক ধরনের ভৌতিক কাণ্ড ঘটে গভীর রাত্রে। কার্জনের লেখা থেকে হুবহু বঙ্গানুবাদ হেস্টিংস হাউস প্রসঙ্গের শুরুতে দেওয়া হয়েছে।

কার্জনসাহেব খুব কড়া ধাতের মানুষ। হেস্টিংস হাউসে ভূত দেখা যায়—আলগাভাবে শুধু এই কথাটা বলে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র তিনি নন। তাঁর সমসাময়িক কালের হেস্টিংস হাউসের প্রত্যক্ষদর্শী বাসিন্দাদের জবানবন্দী নিয়েছেন। তারাও বলেছে গভীর রাত্রে ঘোড়ার গাড়ির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। একটি ছায়াদেহ গাড়ি থেকে নেমে এসে বাড়ির আশপাশে কি যেন খোঁজে।

আর এই হেস্টিংস হাউসের সাম্প্রতিক কালের অধিবাসী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষিকা এবং হস্টেলের ছাত্রীরা বলেন—কখনও কখনও নিশি রাত্রে তাঁরা ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ শুনতে পান। তাঁদের একজন বললেন—'একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেছে—হঠাৎ দেখি হলঘরে ঘুরঘুর করছে একটা ছায়ামূর্তি। দারুণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। যেই আমার সহপাঠিনীরা এল—অমনি সেই ছায়া মিলিয়ে গেল।'

হেস্টিংস হাউসের এক দারোয়ান একটা নতুন খবর জানালো—মাঝে মাঝে অন্ধকার রাত্রে জজ কোর্টের প্রাচীরের দিকে জঙ্গলের ভেতরে একটা আলো দেখতে পাওয়া যায়। রক্তাভ আলোর সেই গোলকটা একবার ডাইনে একবারে বাঁয়ে, কখনো বা সামনে ঘোরাফেরা করে। মনে হয় যেন কেউ আলো হাতে নিয়ে গাছ-গাছালির সেই জমাট অন্ধকারে কিছু খুঁজছে—যেই তারা দল বেঁধে লাঠি নিয়ে সেই রহস্যময় আলোর দিকে ছুটে যায় অমনি দপ্ করে নিভে যায় সেই আলো।

আলো হাতে এই প্রেতমূর্তিরও আছে এক ঐতিহাসিক ভিত্তি।

বেলভেডিয়ারের বাড়ির দক্ষিণে আধুনিক কালের হর্টিকালচার‍্যাল সোসাইটির বাগান থেকে শুরু করে একেবারে হেস্টিংস হাউসের এলাকাটা জুড়ে বাহাত্তর বিঘের জমির মালিক ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। এই জমিটা তিনি দান করেছিলেন তাঁব দ্বিতীয় পত্নী মেরিয়ানের প্রথম পক্ষের (ব্যারন ইমহফের ঔরসজাত) পুত্র জুলিয়াস ইমহফকে। ১৭৮৮ সালে অর্থাৎ হেস্টিংস বিলেতে চলে যাওয়ার তিন বছর পরে জুলিয়াস রাইটারের চাকরি নিয়ে ইণ্ডিয়ায় এসেছিল। ১৭৯২ সালে রাইটার থেকে সে মুর্শিদাবাদের কলেক্টর হয়। তার সাত বছর পব সে প্রমোশন পায় মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের পদে। জুলিয়াস সপরিবারে থাকতো হেস্টিংস হাউসে। এই বাড়িতেই ১৭৯৯ সালে জুলিয়াস মারা যায়। শুধু তাই নয় জুলিয়াসের তিন পুত্র—উইলিয়ম, চার্লস এবং জনের অপঘাত মৃত্যু হয় এই বাড়িতে। তিনটি ছেলেব অকাল মৃত্যুই বহস্যজনক।

উইলিয়মের বয়স যখন দশ তখন সে একদিন হেস্টিংস হাউসের কম্পাউণ্ডে খেলছিল। এমন সময় ঝড় উঠল। সেই ঝড়ের ভেতরে সে খুব লম্বা আর ঢ্যাঙা একটা ছায়ামূর্তি দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। সেইদিনেই তার প্রবল জ্বর এল। সেই জ্বরেই তিনদিন ভুগে মারা গেল। চার্লস তার আয়ার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটা কুয়োর (হেস্টিংস হাউসের কম্পাউণ্ডে তখন একটা কুয়ো ছিল) ভেতরে পড়ে মারা যায়। আর জন বেশ বড় হয়ে কোন অদৃশ্য আততায়ীর হাতে খুন হয়।

এই বৃত্তান্তগুলো জানা যায় হেস্টিংসের কাছে লেখা জুলিয়াসের চিঠিতে—In the grounds between Hasting's House and the Judge's court my three children William, Charles and John were lie buried···হেস্টিংস হাউসের মাঠের কোথাও কবর দেওয়া হয় জুলিয়াস ইমহফ এবং তাঁর তিন ছেলেকে। হেস্টিংসের ঘনিষ্ঠ মহলের অনুমান, পরলোকগত সেই দুর্ভাগা ব্যারন ইমহফের অভিশপ্ত আত্মারই তীব্র আক্রোশে হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র জুলিয়াস সুখী হয়নি এবং তার ছেলেদের রহস্যময় মৃত্যু হয়েছে—তবুও—

তবুও মৃত্যুর পরপার থেকে হয়তো প্রাণের টানেই সে আলো হাতে তার ছেলে আর নাতিদের দেখতে আসে।

৩

মাঝরাতের স্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে কাকাতুয়ার ডাক শোনা যায়। আর দেখা যায়: লম্বা চওড়া মাঝবয়সী এক মহিলার ছায়ামূর্তি। তার গলায় শক্ত করে একটা তোয়ালে বাঁধা—

১৮৫০ সাল।

দুই ছোকরা নীলকর সাহেব বিলেত থেকে এসে কোন খোঁজখবর না করেই ভাড়া নিয়ে বসল ধর্মতলার একটা দোতলা বাড়ি।

কলকাতার থিয়েটারেব তখন খুব নামডাক। দুই বন্ধু মিলে দু'টো টিকিট কিনল থিয়েটারের। কিন্তু এমন কপাল—বিকেল হতে না হতে তাদের একজনের কম্প দিয়ে জ্বর এল। অসুস্থ বন্ধুটি বলল, 'তুই যা, আমি থাকি—আমার টিকিটটা বিক্রি করে দিস।'

ঝাঁ ঝাঁ করছে নিশি রাত। জনহীন রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলো তাকিয়ে আছে প্রেতপাণ্ডুর দৃষ্টিতে। জ্বরের যন্ত্রণায় ঘুম আসছে না সাহেবের চোখে। হঠাৎ বাইরের বারান্দা থেকে কোন নিশাচর পাখির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনতে পেল। সেই সংগে তার কানে এল—তীব্র একটা আর্তনাদের করুণ শব্দ।

সে টলতে টলতে বাইরে এল। অমনি হিম হয়ে গেল তার সারা শরীর। সে স্পষ্ট দেখল, তার বন্ধুর পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল—বেশ লম্বা আর মজবুত চেহারার এক মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা। তাকে 'দেশওয়ালী' অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলেই মনে হল। ভেতরে ভেতরে তার খুব রাগ হলো—এর মধ্যেই মেয়ে-বন্ধু জুটিয়ে ফেলেছে! খুব বাহাদুর ছোকরা! তাকে ব্যাপারটা একেবারে চেপে গিয়েছে!

ভদ্রমহিলা ধীর পায়ে করিডর দিয়ে সিঁড়ির দিকে যেতে শুরু করল। কিন্তু সে একটু অবাক হলো—মহিলাটির গলায় কম্ফর্টারের মত করে একটা তোয়ালে শক্ত করে বাঁধা! ভয়ে আতংকে সে চিৎকার করে উঠল—কে—কে—আপনি—

সঙ্গে সঙ্গে দূরে বারান্দার অন্ধকার কোণে মিলিয়ে গেল সেই ছায়াদেহ ! সেই নিশাচর পাখির আর্তনাদ আর তার ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ কানে এল। হু হু করে একটা বাতাস এল। বাড়ির দরজা জানালার কাচের শার্শিগুলো থর থর করে কেঁপে উঠল।

থিয়েটার থেকে ফিরে এল বন্ধু। রাত তখন ভোর হয়ে আসছে।

—কি রে কেমন আছিস ?

কোন কথা বলল না জ্বরাক্রান্ত বন্ধুটি।

—তুই কি রাগ করেছিস ? তুই যেতে বললি বলেই তো থিয়েটারে গিয়েছিলাম।

—গিয়েছিলি—ভালোই। কিন্তু লেডি ফ্রেণ্ডের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্টটা বোধ হয় 'ক্যানসেল' কবতে ভুলে গিয়েছিলি ?

—জ্বরের ঘোরে কি যা-তা প্রলাপ বকছিস তুই ? একটু থেমে সে বলল, কলকাতা শহরের একটা মেয়ে তো দূরেব কথা—কোন একটা ভদ্রলোকের সঙ্গেও পরিচয় পর্যন্ত হয় নি।

অসুস্থ বন্ধুটির বৃত্তান্ত শুনে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, হ্যাঁ রে ঠিক করে বলতো, জ্বরেব ঘোরে তুই কোন খোয়াব দেখিস নি তো ?

—না স্পষ্ট দেখেছি—আমি বারান্দায় বেরিয়ে যেই তার পিছু পিছু যেতে শুরু করলাম অমনি সে সিঁড়ির মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাহেবরা বাড়ির দারোয়ান এবং পাড়ার লোকদের কাছে খোঁজখবর করতেই জানতে পারল বিচিত্র এক রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত—

লুইস কুপার নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক ছিলেন তখনকার দিনের প্রকাশন-সংস্থা হাণ্টার অ্যাণ্ড কোম্পানির কর্মচারী। তাঁর সাইড বিজনেস ছিল—স্টেবল-কীপিং। বড় বড় সাহেব-সুবোদের ঘোড়া রাখার জন্য আস্তাবল ভাড়া দিত। এসব ছাড়াও টুকটাক আরও নানা রকমের বিজনেস করে বেশ দু'টো পয়সা করেছিল। কলকাতার এখানে-সেখানে কিছু জমি এবং কয়েকটা বাড়িও ছিল তার। বৌবাজারের এখন যেখানে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার চার্চ সেখানে ছিল কুপার সাহেবের নিজস্ব দোতালা বাড়ি। এই বাড়িতেই সপরিবারে বাস করতো কুপার।

কিন্তু তখনকার দিনে বৌবাজারের এই তল্লাটটায় ছিল নিম্ন মধ্যবিত্তদের বাস। এখানে যারা থাকতো তাদের দেখে শহরের ধনী অভিজাতরা নাক সিঁটকাতো তাই। মিসেস কুপার মাঝে মাঝে এই বাড়িটা বিক্রি করে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার বায়না ধরতো।

এমন এক ভাগ্যবিপর্যয় হলো যে, মিসেস কুপারকে অন্য বাড়িতে চলে যেতেই হলো। মাত্র চারদিনের মধ্যে তার দুই ছেলে মারা গেল। তাদের একজনের বয়স ছিল পনের আর একজনের কুড়ি। দারুণ শোকে ভেঙে পড়ল মিসেস কুপার। কয়েকদিন পরেই তার হাবভাবে পাগলের লক্ষণ ফুটে উঠল। ভবানীপুরের মেণ্টাল অ্যাসাইলামে তাকে নিয়ে গেল কুপার। সেখান থেকে কিছুদিন তার চিকিৎসা চলল। মোটামুটি একটু ভালো হতেই মিসেস কুপার আর সেখানে থাকতে চাইল না। তাকে বাড়িতে নিয়ে এল কুপার। কিন্তু—

হিতে বিপরীত হলো। নির্জন জনশূন্য বাড়ি হা করে গিলে খেতে আসে মিসেস কুপারকে। বাড়ির যেদিকে তাকায় সেইদিকেই ছেলেদের অজস্র স্মৃতিচিহ্ন তাকে আবার অস্থির আর উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল। কুপার তখন ভাবল, কোথাও একটা আলাদা বাড়ি ভাড়া করে ওকে রাখলে কেমন হয়। ও তো একা থাকতেই ভালোবাসে! কাউকে ওর ঘরে কাজ করতে দেয় না। কোন বাবুর্চিকে রান্না করতে দেয় না। ওর ওইসব পাগলামি নিয়ে ওর একা নিরিবিলিতেই থাকা ভালো। তাই ধর্মতলায় দোতলা বাড়ি ভাড়া করে স্ত্রীকে সেখানে রাখল কুপার। আর সে রয়ে গেল বৌবাজারের পুরানো বাড়িতে।

প্রতিদিন সকালে কুপার তার বগি গাড়ি করে চার্চে যেত। সেখানে 'প্রেয়ার' সেরে যেত স্ত্রীর কাছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে। সেখানে থেকে দুজনে বাজারে যেত। কোনদিনই এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হতো না।

মিসেস কুপার কাউকে বিশ্বাস করতো না। কিন্তু তার পাগলামির অদ্ভুত একটা লক্ষণ ছিল—তার টাকাপয়সা গয়নাগাটি বাড়ির দারোয়ানকে ডেকে ডেকে দেখাতো। মি. কুপার জোরজবরদস্তি করে শুধু এই একটা দারোয়ানকেই রেখেছিল! আয়া কি কোন রাঁধুনী রাখলেই তাকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিত। যা হোক, এসব মূল্যবান জিনিস চাকর-বাকরদের

দেখানো ঠিক নয়—একথা বার বার বলেছে কুপার। কিন্তু তার নিষেধ শুনতো না। শেষপর্যন্ত তার এই পাগলামিই বিপদ ডেকে এনেছিল।

৬ই মার্চ ১৮৪৫ সাল। সকালে রুটিন অনুযায়ী কুপার সাহেব এল ধর্মতলার বাড়িতে। দোতালায় উঠতেই সে দেখল, বারান্দার পর্দাটা তখনো তোলা হয় নি। কী ব্যাপার—এখনো ঘুমুচ্ছে মিসেস কুপার! হঠাৎ নজরে পড়ল লম্বা বারান্দার ফিকে অন্ধকারে কে একজন আড়া-আড়িভাবে শুয়ে রয়েছে। স্ত্রীলোক বলে মনে হলো। মনে মনে খুব খুশী হলো কুপার সাহেব। যাক শেষ পর্যন্ত মতি ফিরেছে। কোন আয়াকে কাজে লাগিয়েছে মিসেস। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কুপার। আর মাথার ভেতরটা বোঁ করে ঘুরে উঠল। কাটা একটা গাছের মত পড়ে রয়েছে মিসেস কুপারের প্রাণহীন দেহটা। গলায় খুব শক্ত করে একটা তোয়ালে বাঁধা। নাকের নীচে জমাট রক্ত। সেই রক্ত চেটে চেটে খাচ্ছে দুটো আরশোলা। আর পাশে পড়ে রয়েছে তার সেই মেহগিনি কাঠের গয়নার বাক্সটা—হাট করে খোলা। আর সবচেয়ে আশ্চর্য তার পোষা কাকাতুয়াটা কার্নিশের গায়ে ভয়ে সিঁটিয়ে বসে রয়েছে। দারোয়ান নেই। কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে।

পুলিস এল। পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারল—মাঝরাতে তারা গোঙানির আওয়াজ আর কাকাতুয়ার আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলার মাথার গোলমাল আছে বলে তেমন অস্বাভাবিক বলে কিছু মনে করে নি।

পুলিস এবং কুপার সাহেব অনেক চেষ্টা করেও খুনীর কোন হদিস করতে পারল না।

সেই দুর্ঘটনার পর থেকে ধর্মতলার এই বাড়িটার ভুতুড়ে বাড়ি বলে দুর্নাম রটে গেল। এই বৃত্তান্ত শেষ করে পাড়ার এক নেতৃস্থানীয় ভদ্রলোক বলল নীলকর সাহেবদের—প্রায় পাঁচ বছর হলো ঘটনা ঘটেছে।

কিন্তু এখনও কোন কোনদিন মাঝরাতে কাকাতুয়ার চিৎকার আর মেয়েলী গলার আর্তনাদ শুনতে পাওয়া যায়। আর দেখা যায়, দোতলার বারান্দায় একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি পায়চারি করছে—এসব শুনে নীলকর সাহেবরা সেই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

আর নিশি রাত্রে সেই জনহীন বিশাল বাড়ির ওপরের বারান্দায় মিসেস কুপারের যে বিদেহী প্রেতচ্ছায়াটা হাওয়ার ওপর পা ফেলে ফেলে যেমন ঘুরতো তেমনি নির্বিঘ্নে ঘুরতে লাগল। আর কেউ কখনও তার শান্তিকে বিঘ্নিত করতে সে-বাড়িতে আসে নি।

ধর্মতলার এই অভিশপ্ত বাড়িটা আর নেই। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে সেই জমির ওপরেই মেথডিস্ট চার্চের বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

৪

যিনি নিয়মিত দুপুরবেলা খেতে বসে পরলোকগত স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেন তিনি কে—কোথায় ঘটেছিল এই অলৌকিক ঘটনা—

জোড়াবাগান থানার কাছে আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই বাড়িটা।

বিডন স্কোয়ার অর্থাৎ আধুনিক কালের রবীন্দ্রকানন থেকে নিমতলা স্ট্রীট ধরে গঙ্গার দিকে কিছুদূর গেলেই বাঁদিকে পড়বে জোড়াবাগান থানা আর ডানদিকে নিমতলার মিত্রবাড়ি। সাবেককালের এই চকমিলানো বাড়ির অন্দর-মহলের কোণের দিকে বেশ প্রশস্ত খাওয়ার ঘর। তার কালো পাথরে বাঁধানো ঝকঝকে মেঝেতে মুখ দেখা যায়।

ভরদুপুর।

খাওয়ার ঘরের ঠিক মাঝখানে কাঁঠালকাঠের একটি পিঁড়ি পাতা রয়েছে। তার সামনে মার্বেল পাথরের 'টপ' অর্থাৎ ছোট্ট একটা বেদী। এই টপের ডানদিকে রূপোর বারকোশে ঢাকা একটা বড় কাঁসার গ্লাস। রূপোর থালার চারিদিকে রূপোর ছোট ছোট বাটিতে পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে পরিবেশন করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল পুত্রবধূরা। তাঁদের একজন সেই রূপোর থালার ওপর সুগন্ধী চালের গরম ভাতের পরিমাণের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির চোখে তাকিয়ে তার বড় জা-কে বলল—দিদি, বাবামশায়ের এই ভাতে হবে তো?

—শোন ছোট, তুই বরং আর একটু ভাত দিয়েই দে। একটু থেমে বড়-জা বললেন, জানিস তো উনি খেতে শুরু করলে কিছু দিতেও তাঁর সামনে আসা বারণ!

—কেন? ছোট ঠাকুরঝি যে বাইরে বারান্দার এক কোণে বসে থাকে!

—থাকলে কি হবে, খেতে খেতে কোন কিছুর দরকার পড়লেও ওঁকে কোনদিন ঠাকুঝিকে কিছু বলতে শুনেছিস?

এইবারে ছোট বৌ চুপ করে রইল।

তার মনে পড়ল, সত্যিই বাবামশায়ের খাওয়ার সময় বাইবেব বাবান্দায় ঠায় বসে থাকে তাদের বড় আদবের এগাবো বছবেব ঠাকুর্বাঝ। কিন্তু কোনদিন কখনো তাকে তিনি বলেন নি—এই যা তো, বৌমাদের একটু ভাত নিয়ে আসতে বল—কি ডাল নিয়ে আসতে বল—

তাঁর কড়া নিষেধ—তাঁর খাওয়াব সময় খাওয়ার ঘবে কাবো আসা হবে না। বিচিত্র আর রহস্যময় সেই হুকুম পুত্রবধুদেব বড় বিষন্ন ও ব্যথিত করে তোলে। শাশুড়ী নেই। তারা শ্বশুরের সেবাযত্ন করবে, শাশুড়ীর অভাবটা তাঁকে কিছুতেই বুঝতে দেবে না—এই বাসনা ছিল তাদের মনে। কিন্তু কেন কোন অপরাধে তাদের যে বঞ্চিত করা হলো; সেবা তো দূরের কথা, খাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত কেন তাদের তাঁর সম্মুখে যেতে দেওয়া হয় না—তা তারা জানে না।

আবার তাদেব মনের ভেতরে কৌতূহলের আগুনও ধিকি ধিকি জ্বলে—কেন উনি একেবারে একা একা খান—কেউ দৈবাৎ খাওয়ার সামনে এসে পড়লে কেন তিনি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়েন! বাড়ির পুরুষরাও এই ব্যাপারে একেবারে মুখে কুলুপ দিয়ে আছে। অতএব তাদেরও চুপ করে থাকতে হয়েছে। তারা শুধু যন্ত্রচালিতের মত খাওয়ার ঘরে পরিপাটি করে খাবার সাজিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে আসে।

সেদিনও নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নি। তিন জা মিলেমিশে থালা সাজিয়ে ঢেকে রেখে এসেছে। এখুনি এসে পড়বেন তিনি। কলঘরে স্নান করছেন।

কয়েক মুহূর্ত পরেই উঠোনে খড়মের শব্দ বেজে উঠল—খট্-খট্-খট্—কর্তা স্নান করে বেরিয়ে এসে সূর্যপ্রণাম করেই খাওয়ার ঘরে ঢুকলেন।

যথারীতি দরজার পাল্লাদু'টোকে খুব ভালো করে আটকে দিলেন। আবার হঠাৎ দরজাটা খুলে মুখটা বাড়িয়ে বললেন তাঁর এগারো বছরের ভাইঝিকে—তোকে প্রত্যেকদিন নিষেধ করি বারান্দায় বসে থাকতে—কথা শুনিস না কেন বল তো ?

—জ্যাঠামণি, তোমার গলায় জল বেধে যেতেও তো পারে—ভারিক্কী গিন্নীবান্নীর মত তার কথা শুনে আর গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পারলেন না। হেসে ফেললেন কর্তা। আর কিছু বললেন না।

কর্তা নিঃশব্দে খেয়ে চলেছেন।

বাইরে ভরদুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। আর বহু-বহু দূর থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠ একটা চিলের ডাক শোনা যাচ্ছে থেকে থেকে। কর্তা নিঃশব্দে খেয়ে চলেছেন।

—কি গো, অত তাড়াতাড়ি খাচ্ছো কেন? শরীরটা খারাপ হয়ে যাবে যে—একতলার খাওয়ার ঘরের সেই আবছায়া অন্ধকারে অপূর্ব সুন্দরী এক রমণীর ছায়াদেহ ফুটে উঠল।

—আর বলো কেন, ইউনিভারসিটির ফেলো হয়েছি জানো তো—সেখানে মিটিং সেরেই যেতে হবে আবার ডিরোজিও সাহেবের বাড়িতে, সেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, রামতনু লাহিড়ী, এঁরা সবাই আসছেন।

—সারাজীবনই তো দেশের ও দশের জন্য খেটে খেটে হাড় কালি করে ফেললে—

কী ব্যাপার, জ্যাঠামশায় কার সঙ্গে কথা বলছেন! ভাইঝি পা টিপে দরজায় উঁকি দিতেই চমকে উঠল—খাওয়ার ঘরের সেই আবছায়া অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—জেঠীমার ছায়ামূর্তি। পরনে লালপেড়ে গরদের শাড়ি। ঠিক যেমনটি উনি পরতেন। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। এগারো বছরের সেই মেয়ে ভয়ে-আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল—এ কী জ্যাঠামশাই—জেঠীমার সঙ্গে আপনি কথা বলছেন—

চোখের পলকে মিলিয়ে গেল সেই ছায়াদেহ।

আরো একদিন।

যথারীতি খেতে বসেছেন কর্তা। সেদিনও স্বামীর সামনে এসে বসল সে।

—কি গো, আজ যে একেবারেই কিছু খাচ্ছো না !

—কি খাবো বলো, তুমি নেই ! বুদ্ধি-পরামর্শ যে কার সঙ্গে করি !

—কেন, আবার কি হলো ?

—তোমার ছোট ছেলে মতিটার ভারী অসুখ। শহরের সব্বাইতে বড় ডাক্তার—

—কোন লাভ নেই। মতিকে আমি নেব। সেখানে আমি বড় একা।

—তুমি বলছো কি গো—না-না—তুমি ওকে কেড়ে নিও না, তোমার হাত দু'টো ধরে বলছি—কর্তা খাওয়া ছেড়ে উঠে ব্যাকুল হয়ে তার দিকে যেতেই ঝাপসা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সে।

পরদিন মতি মারা গেল।

এসব ১৮৬২ সালের কথা। যিনি নিয়মিত দুপুরে খেতে বসে পরলোকগতা স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেন, যাঁর জীবনে ঘটেছিল রোমাঞ্চকর এই অলৌকিক ঘটনা, তিনি বিগত শতাব্দীর স্বর্ণপ্রসূ সেই বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের অন্যতম নায়ক—ডিরোজিও'র ইয়ং বেঙ্গলের নেতা, যুগান্তকারী গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলালে'র রচয়িতা সেই টেকচাঁদ ঠাকুর, ওরফে—

প্যারীচাঁদ মিত্র।

উপরোক্ত বিচিত্র ঘটনাটি মিত্র-পরিবারের বংশধরদের মুখে শোনা যায়। প্যারীচাঁদ যে তাঁর পরলোকগত স্ত্রীর অশরীরী আত্মার সঙ্গে কথা বলতেন তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, রাজকৃষ্ণ মিত্রের 'শোকবিজয়' গ্রন্থে তাঁর এই উক্তির * ভেতরে—"১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার (প্যারীচাঁদ) স্ত্রীবিয়োগ হইলে তিনি নিদারুণ শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন—এই সময়ে পরজগতের সংবাদ জানিবার বাসনা তাঁহার মনে জাগিয়া ওঠে। প্যারীচাঁদ তখন কলিকাতার বেঙ্গল লাইব্রেরির (সাম্প্রতিক কালের জাতীয় গ্রন্থাগার) সম্পাদক ছিলেন। কাজেই ইউরোপ আমেরিকায় প্রকাশিত পারলৌকিক চর্চার বহু বই পড়া ছিল। পরলোকগত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যই তিনি নিজের বাটিতেই সর্বপ্রথম চক্র করিয়া নিজেই মিডিয়াম হইয়া বসিতে আরম্ভ করেন। প্যারীচাঁদ বাবু মিডিয়াম হইবার পর হইতে

* As quoted in 'পরলোকের কথা'—মৃণালকান্তি ঘোষ, পৃঃ ১০৯

তাঁহার পরলোকগতা পত্নী সর্বদা তাঁহার কাছে থাকিয়া অন্তরীক্ষে পতিসেবা ও আপদবিপদ হইতেও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেন। প্যারীচাঁদ চক্ষু বুজিয়াও তাঁর স্ত্রীকে দেখিতে পাইতেন ··”

প্যারীচাঁদের জীবনীকার লিখছেন—“প্যারীচাঁদ খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যা বামাকালীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।···পত্নীবিয়োগের পর হইতে তিনি প্রেততত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।”

প্যারীচাঁদ নিজেও বলেছেন—In 1860 I lost my wife which convulsed me much I took to the study of spiritualism···এই সময় প্যারীচাঁদ লণ্ডনের ‘স্পিরিচুয়ালিস্ট’ এবং বোস্টনের (আমেরিকা) “ব্যানার অফ লাইট” (প্রেততত্ত্ববিষয়ক পত্রিকা) আর বোম্বাইয়ের ‘থিয়োসফিস্ট’ পত্রিকায় নিয়মিত প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—উনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে যখন নতুন চিন্তা, নতুন ভাবধারার একটা জোয়ার এসেছিল তখন এদেশে ‘স্পিরিচুয়্যালিজম’ অর্থাৎ আত্মাসম্বন্ধীয় চর্চাও শুরু হয়েছিল প্রধানত প্যারীচাঁদেরই প্রচেষ্টায়। তারই নেতৃত্বে ১৮৮০ সালে কলকাতায় ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশান অফ স্পিরিচুয়্যালিস্ট নামে একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল। তার সভাপতি ছিলেন জে. জি মিউগেন্স (Meugens), আর প্যারীচাঁদ ছিলেন সহকারী সভাপতি।

তাঁরই আমন্ত্রণে নিউইয়র্ক থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি কর্নেল ওলকট (Col. H. S. Olcott) এবং প্রেততত্ত্ববিশেষজ্ঞা মাদাম ব্লাভট্স্কি (Mme H. P. Blavtsky) কলকাতায় এসেছিলেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ। এই বছরের এপ্রিল মাসে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির যে বঙ্গীয় শাখার প্রতিষ্ঠা হয় তার সভাপতিও ছিলেন প্যারীচাঁদ।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই তিনি বিলেতে ও আমেরিকা থেকে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে রাশি রাশি বই এনে নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করতেন। শুধু থিয়োরেটিক্যাল পড়াই নয়—প্যাবীচাঁদ এবং ক্যালকাটা ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশান অফ স্পিরিচুয়ালিস্টের সভাপতি মিউগেন্স ও অন্যান্য সভ্য চিরকালের অজানা রহস্যময় সেই পরলোক থেকে কোন বিদেহী

আত্মাকে সাদরে আহ্বান করে তার জীবনকাহিনী শুনতেন, কখনো কখনো তার সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করতেন। কেমন করে মৃত্যুলোক থেকে স্পিরিটকে নিয়ে আসতেন সেই চিত্তাকর্ষক রোমাঞ্চকর কাহিনী প্যারীচাঁদের নিজের জবানীতেই শুনুন—

"আমাদের স্পিরিচুয়ালিস্ট অ্যাসোসিয়েশানের (ক্যালকাটা ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশান অফ স্পিরিচুয়ালিস্ট) অফিস ছিল ডালহৌসি স্কোয়ারে ৩নং চার্চ লেনে।

প্রত্যেক রবিবার দুপুরে এই বাড়িতে এসে আমরা পরলোকতত্ত্ব নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। কোন কোন সময় আমাদের আর একজন বিশিষ্ট সভ্য কলকাতা হাইকোর্টের সলিসিটার পূর্ণচন্দ্র মুখার্জীর বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে, আবার কখনো অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত ফরাসী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বেরিগনীর* চেম্বারেও আমাদের পারলৌকিক চর্চার বৈঠক বসতো।

একদিন মিউগেন্স সাহেবকে বললাম—আমি বাড়িতে মাঝে মাঝে মিডিয়াম হয়ে 'স্পিরিটের' সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু খুব ভালো পারছি বলে মনে হচ্ছে না। মিউগেন্স সাহেবের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললাম,—অথচ বিলেতের কাগজে পড়েছি, এফিসিয়েণ্ট মিডিয়ামের সাহায্যে তারা একান্ত আপনজনের স্পিরিট নিয়ে আসছে—

—মিডিয়াম জিনিসটা কি—কারা হতে পারে মিডিয়াম, আর এক সলিসিটার নরেনবাবু কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

—মিডিয়াম হলো, মৃত ব্যক্তির আত্মা এবং জীবিতদের ভেতরে যোগাযোগকারী—A link between the dead and the living. একটু থেমে আবার মিউগেন্স সাহেব বললেন,—যাদের মনের গঠন খুব বলিষ্ঠ এবং যাদের একাগ্রতা অর্থাৎ কনসেনট্রেশান করার ক্ষমতা খুব বেশি তারাই ভালো মিডিয়াম হতে পারে—কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করলেন। কেন যেন খুশীর আমেজে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

* ইনিই কলকাতায় প্রথম পরলোকচর্চা এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রবর্তন করেন। ১৮৬৩ সালে এখানে এসেছিলেন—দ্রষ্টব্য : পরলোকের কথা—মৃণালকান্তি ঘোষ—পৃঃ ১০৯

বললেন—বিলেতে আমার স্পিরিচুয়ালিস্ট বন্ধুদের কাছে লিখেছি একজন মিডিয়ামকে পাঠাতে। কিছুদিন বাদেই এসে পড়বে।

ইংল্যান্ড থেকে মিডিয়াম আসবে জেনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। তাঁর মাধ্যমে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবো, আনন্দে উত্তেজনায় অধীর হয়ে মিডিয়ামের অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু—

হতাশ হতে হলো। একদিন মিউগেন্স জানালেন—বিলেত থেকে মিডিয়াম আসছেন না।

দিন কাটে। আমরা একজন স্যাটেবল মিডিয়ামের খোঁজখবর করতে থাকি। বন্ধুবান্ধবদের ভেতরে একে বলি তাকে বলি।

একদিন ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মিত্র নিয়ে এলেন এক যুবককে। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। চোখে-মুখেও বুদ্ধির ছাপ আছে। তার নাম নিত্যরঞ্জন ঘোষ। সে নাকি খুব ভালো মিডিয়াম। যে কোন আত্মাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারে। অশরীরী সেই আত্মা তার ওপরে ভর করে। পরলোকগত মানুষটির যা কিছু বক্তব্য ওই মিডিয়ামের মাধ্যমেই বলতে থাকে।

সেদিনটার কথা আজও আমার মনে আছে। আমি, মিউগেন্স এবং তাঁর এক বন্ধু মি. ইনিয়াস ব্রুস (Eneas Bruce) ও প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী আরও কয়েকজন ভদ্রলোক চার্চ লেনের বাড়িতে দোতলার কোণের ঘরে ফরাশের ওপরে গোল হয়ে বসলাম। নিত্য বসল আমাদের ঠিক মাঝখানে।

বাইরে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘন হয়ে নামছিল।

—আলোটা আরও কমিয়ে দিন, নিত্য গম্ভীর হয়ে বলল, অন্ধকার না হলে তারা আসতে চায় না।

তার নির্দেশ অনুযায়ী সেজবাতির জোর কমিয়ে একেবারে নিভু নিভু করে দেওয়া হলো।

ঘরের সেই ছায়া-ছায়া অন্ধকারে আমাদের এক-একজনকেও প্রেতলোকের অভিশপ্ত আত্মার মত মনে হতে লাগল। আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি। নিত্যর মারফত কোন প্রেত আসবে—কেমন করে আসবে—সেই ভেবে অসহ্য উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠছি। আমরা লক্ষ্য

করলাম—নিত্যর সারা শরীর যেন একটু একটু করে শক্ত হয়ে উঠছে। থর থর করে কাঁপছে সে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ালো। আর আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়ে সে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর সেই বৃষ্টি মাথায় করেই পাশের বাড়ির প্রাচীরের গায়ে একটা নিমগাছে তড়াক করে উঠে পড়ল।

আমাদের তো গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল এই কাণ্ডকারখানা দেখে। মিউগেন্স সাহেব করলেন কি—নিজেই সেই গাছে উঠে জোর করে নিত্যকে নামিয়ে নিয়ে এলেন।

সে তখন একেবারে অন্য মানুষ। তার মুখের দু'পাশ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে। কেমন নিস্তেজ আর অলস হয়ে বসে রইলো সে। চোখদু'টোর দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত আর কেমন সুদূর। আমাদের কাউকে যেন দেখেও দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ বিকৃত গলায় বলতে লাগল—

—আপনারা কেন আমাকে এখানে ডেকেছেন? আমার সম্বন্ধে জানতে চান? তবে শুনুন—

আমার নাম ভোলানাথ. মুখার্জী। যশোরে বাড়ি। চার পাঁচজন দুর্বৃত্ত আমাকে নির্মমভাবে খুন করেছিল। তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবো বলেই আমি পৃথিবীর আশেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। আমাকে হত্যা করেছিল পাঁচ হাজার টাকার লোভে। এই টাকাটা খুনীরা এই চার্চ লেনেরই কাছে হেয়ার স্ট্রীটের একটি বাড়িতে পুঁতে রেখেছিল। তাই আমি এই অঞ্চলেই বেশি আনাগোনা করি। কিন্তু—

ভোলানাথ মুখার্জীর অশরীরী আত্মা নিত্যরঞ্জন ঘোষের মাধ্যমে· তার জীবনকাহিনী বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল। আবার বলল—এখানে থাকতে আমার আর ভালো লাগছে না—এই স্তরের বেশীর ভাগই আমার মত খুন হওয়া কিম্বা গলায় দড়ি দেওয়া সব বিক্ষুব্ধ এবং অভিশপ্ত আত্মা—অন্ধকার ঘরে তার কথাগুলো কেমন কাতর কান্নার মত শোনালো। আবার বলল—আমার স্ত্রী আমার বছর দু'য়েক আগে মারা গিয়েছে। সে দেখতে যেমন সুন্দরী তেমনি তার ধর্মে-কর্মে খুব মতি ছিল। ফলে তার আত্মা থাকে অনেক ওপরের স্তরে। সেইখান থেকে সে ক্রমাগত আমার জন্য প্রার্থনা করছে—হয়তো আমিও কিছুদিন বাদে ওপরের স্তরে তার কাছে চলে যেতে পারবো। তবে সে-সময়

এখনও আসে নি। আমাকে আর কষ্ট দেবেন না—আমি এখন যাই—তার কথা শেষ হতে না হতে খোলা জানালা দিয়ে সাঁ সাঁ করে একটা দমকা বাতাস আছড়ে পড়ল ঘরে। আর সেই নিমগাছটা প্রবল বেগে আন্দোলিত হলো। মিডিয়াম নিত্যরঞ্জন ঘোষ লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপরে।"

আরো একদিন। তারিখটা মনে আছে ১৯শে জুন, ১৮৮১ সাল।

সেদিন সমিতির সভ্য পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বেলগাছিয়ার বাগান-বাড়িতে আধ্যাত্মিক চক্রের বৈঠক বসেছিল। মিডিয়াম নিত্যরঞ্জন ঘোষের মাধ্যমে এইদিন যার আত্মা এসেছিল তার নাম দেবেন্দ্রনাথ তর্করত্ন।

তিনি বলতে শুরু করলেন—বারাকপুরে আমার বাড়ি। মাত্র ছয়বছর তিনমাস আগে আমি মারা গিয়েছি। আপনারা যোগক্রিয়ার সাহায্যে এই যে পরলোকগত আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, তাতে আমি খুবই আনন্দিত। একমাত্র যোগবলেই পরলোকের সঙ্গে ইহলোকের সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়। 'যোগ' মানেই পরম আনন্দময় ব্রহ্মের ধ্যান। আমি এখন যে দ্বিতীয় স্তর থেকে আসছি সেখানে প্রতিটি আত্মাই পবিত্র আত্মা। সেখানে আমাদের একমাত্র কাজ—ত্বং জপামি—ত্বং ভজামি—অর্থাৎ আমরা সেই আনন্দময়কে সর্বদা চিন্তা করছি—তাতে আমরা মোহিত হচ্ছি।

কৈশোর কাল থেকেই দেবদ্বিজে আমার খুব ভক্তি ছিল। আমার বয়স যখন আঠারো তখন চাকরির খোঁজে লখনউ গিয়ে এক সন্ন্যাসীর দেখা পেয়েছিলাম। তাঁর কাছেই আমি 'যোগ' শিখি। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার সেই গুরুদেব বললেন—আমার কাছে যা শিখেছো তার চেয়ে বেশি আর শিখতে পারবে না। তুমি অন্য কোন গুরুর খোঁজ করো—বলেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমি বিন্ধ্যগিরিতে এলাম। সেখানে ছিলাম প্রায় ষোল বছর। তারপরে আমি এলাম তিন-পাহাড়ে। এখানে তিনজন যোগী সন্ন্যাসীর সঙ্গে কিছুদিন বেশ আনন্দে কাটল। এখানে আমি অসুখে পড়লাম। যে মুহূর্তে মৃত্যু এসে উপস্থিত হলো আমি দেখলাম—সেই দিব্যকান্তি জ্যোতির্ময় পুরুষ—লখনউয়ের আমার সেই গুরুদেব। সস্নেহে আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, বৎস ভয় পেও না—আমি তোমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবো যেখানে কোন লোভ নেই, পাপ নেই।

সত্যিই মৃত্যুর পরে এমন জায়গায় এলাম যেখানে পৃথিবীর মত দিন নেই, রাত নেই। কিন্তু এমন একটা অপরূপ আলোয় চারিদিক ভরে থাকে, মনে হয় যেন এখানে বুঝি অহরহঃ গোধূলি বিরাজ করছে। নদীগুলোর জল মিষ্টি। গাছে গাছে ঝুলছে সুস্বাদু, রসালো ফল। সবচেয়ে আশ্চর্য, ইচ্ছে করলেই সেখানে যে কোন জিনিস পেতে পারি—কিন্তু মনে কোন আকাঙ্ক্ষাই জাগে না। আপনারা পরম আনন্দময় ব্রহ্মের ধ্যান করুন—আপনারাও আসতে পাবেন আমাদের এই স্তরে—এই অপরূপ সুন্দর ভুবনে। আপনাদের মিডিয়াম আর আমাকে ধরে রাখতে পারছে না—আমি এখন যাবো।

কোন স্পিরিট পরকালের দিকে যাত্রা করলে যেমন হিমশীতল একটা বাতাস আসে—তেমনি হু হু করে ঠান্ডা হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরে। মিডিয়াম নিত্যরঞ্জন নির্জীব হয়ে বসে রইল।

প্যারীচাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যোগসাধন এবং নিবিড়ভাবে অধ্যাত্মচর্চা করলে পরলোকের আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী মিউগেন্স সাহেবও বলেছেন—যদি একাগ্রতার সঙ্গে চিন্তা করা যায় তাহলে Spirit can appear before us in materialised form. অশরীরী আত্মা তার কায়া নিয়েই সামনে এসে দাঁড়ায়।

কখনো তিননম্বর চার্চ লেনে, কখনো বেলগাছিয়ার পূর্ণবাবুর বাগান-বাড়িতে আবার কোন সময় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বেরিগনীর চেম্বারে এবং নিজের নিমতলার বাড়িতে পারলৌকিক চর্চার চক্রে বসেছিলেন প্যারীচাঁদ। বিভিন্ন স্পিরিটের মুখে তাদের নানারকম চিত্তাকর্ষক জীবন-কাহিনী শুনেছেন তিনি—সেসব কথা বিস্তারিত লেখা আছে তাঁর লেখা আত্মাসম্বন্ধীয় গ্রন্থে, আছে মৃণালকান্তি ঘোষের বিখ্যাত বই 'পরলোকের কথা'য়। এই দু'টো গ্রন্থকে কলকাতায় পারলৌকিক চর্চার ইতিহাসের দলিল বলা যায়। কিন্তু সে-ইতিহাস বর্তমান গ্রন্থের বিষয়ভুক্ত নয়।

এবার আবার আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই ঐতিহাসিক বাড়িতে—নিমতলার 'মিত্র-হাউসে'র সেই অন্দরমহলের খাওয়ার ঘরে যেখানে প্যারীচাঁদ পরলোকগত স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। বর্তমানে মিত্রদের এই বাড়ির হাতবদল হয়েছে। কোন এক জনৈক চৌধুরী এখন এই বাড়ির মালিক।

এই বাড়িতে প্যারীচাঁদ যে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনই শুধু করতেন তা নয়, ইউরোপ থেকে আগত সুবিখ্যাত থিয়োসফিস্ট এগলিণ্টন সাহেবকে মিডিয়াম করে পুত্র অমৃতলালকে নিয়ে যে চক্রে বসেছিলেন সেখানেও তাঁর স্ত্রী বামাকালীর অশরীরী আত্মা এসেছিল। ২৯শে ডিসেম্বর ১৮৮১ সালের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কাগজে এই পারলৌকিক চক্র সম্বন্ধে প্যারীচাঁদ লিখছেন—

"২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮১।

বেলা বারোটা। বাইরে দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। আমার বাড়ির একটা ছোট ঘরে এগলিণ্টন সাহেব, আমার পুত্র এবং আরও দুই বন্ধুকে লইয়া একটা টেবিলের চারিপার্শ্বে চক্র করিয়া বসিয়াছিলাম। আমরা একখানি পরিষ্কার শ্লেট মিডিয়াম এগলিণ্টন সাহেবের হাতে দিলাম। তিনি শ্লেটখানি এক টুকরা পেনসিলসহ টেবিলের নিম্ন দিকে চাপ দিলেন। অমৃতলাল প্রশ্ন করিতে শুরু করল—

প্র। আপনিই কি আমার মাতাঠাকুরানী? আপনি এখন কোন স্তরে?

শ্লেটে ঠক্ ঠক্ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। শব্দ থামিবামাত্র দেখা গেল শ্লেটে উত্তর লেখা পড়িতেছে—

উ। আমিই তোমার মা। আমি এখন পঞ্চম স্তরে।

প্র। আপনি কি পিতামহাশয়কে কিছু বলিবেন?"

এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথাই লেখা হয়েছিল—সেসব প্যারীচাঁদ লেখেন নি।

সুবিখ্যাত পরলোকবাদী এবং পারলৌকিকচর্চায় অগ্রগামী প্যারীচাঁদের স্মৃতিবিজড়িত ও বিভিন্ন বিদেহী আত্মা অধ্যুষিত এই বাড়ি সাম্প্রতিক কালের ১৪ থেকে ১৭নম্বর হরলাল দাস লেন জুড়ে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর আছে সেই তিন নম্বর চার্চ লেনের বাড়ি, যেখানে সর্বপ্রথম প্রেতচর্চা শুরু হয়েছিল।

৫

ইংরেজী ছাড়া আর কোন ভাষা যে জানতো না সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণীটি হঠাৎ উর্দুতে কথা বলতে লাগল কেন ?

এণ্টালি অঞ্চলের হসপিট্যাল রোডের বাসিন্দারা বেশীর ভাগই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। এই রাস্তার ওপরেই একটা জীর্ণ দোতালা বাড়ি।

না। প্রেত-অধ্যুষিত এই বাড়ির নাম্বার বলতে পারবো না। আমি শুধু বলবো, এক অশরীরী আত্মার নির্মম অত্যাচারে অভিশপ্ত এই বাড়ির লোকগুলো কেমন করে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, এখানকারই ছাব্বিশ বছরের এক তরুণী কেমন যেন বদ্ধ উন্মাদিনীর মত হয়ে গিয়েছিল।—এসব কথা লিখেছেন এই নিদারুণ শোকাবহ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এককালের খ্যাতিমান মনস্তত্ত্ববিদ্ ডক্টর সুহৃদকৃষ্ণ বসু। ডক্টর বোস ঠিক যেমন লিখেছেন * এখানে তেমনি বলা হলো—

"১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাস।

কলকাতায় বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছিল। সেদিন ছিল রবিবার। ছুটির দিন। গায়ে বেশ করে লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায় বসে যেই চায়ের কাপে চুমুক দিতে যাবো এমন সময় চাকর এসে খবর দিল—এক সাহেব দেখা করতে এসেছে—

বাধ্য হয়ে এলাম ড্রইংরুমে। দেখলাম—মাঝবয়সী এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক মাথা নীচু করে বসে রয়েছে। চোখের কোলে কোলে কালি পড়েছে। আমাকে দেখেই হাতজোড় করে বলল, গুড মর্নিং স্যার—আমি খুব বিপদে পড়েছি। আমার একমাত্র বোনের ওপর কোন দুষ্টু প্রেতাত্মা ভর করেছে। দিন রাত শুধু ঘরের ভেতরে পায়চারি করছে রোজী। আর সবচেয়ে আশ্চর্য—উর্দু ভাষায় বিড় বিড় করে বকছে। অথচ আমার চোদ্দ পুরুষ ইংরেজী ছাড়া আর কোন ভাষা জানে না। যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই মারছে রোজী—একটু থামল সে। আবার কেমন

* ব্রহ্মবিদ্যা, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা : মাঘ, ১৩৪৭ সাল।

ফ্যাসফেসে গলায় বলল, ওর রাগটা যেন আমার ঠাকুমা, মাসীমা, মা—মানে এল্ডারলি মেয়েদের ওপরেই বেশি।

—কিন্তু আমি তো ওঝা নই এবং কোন তুকতাকও জানি না—অতএব আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

—স্যার, আমি শুনেছি এইরকম বিপদে আপনি অনেককে সাহায্য করেছেন—লোকটা কেমন করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন না স্যার, রোজীর অবস্থাটা দেখে অন্তত কোন সৎপরামর্শ তো দিতে পারবেন!

এরপরে আর কিছু বলা যায় না। বাধ্য হয়ে যেতে হলো। এসব কেসে দেরী করতে নেই। তাই তখুনি তার সঙ্গে গেলাম।

রাস্তার ওপর থেকেই দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি। সিঁড়িটা কাঠের। তার এখানে-সেখানে ঘুণ ধরেছে। খুব সন্তপর্ণে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। নীচের তলায় ছোট ছোট অনেকগুলো ঘর। সেখানে—

সেখানে তাদের ভাড়াটেরা থাকে। দোতলার মুখেই বিশাল এক হলঘর। তার দু'পাশে দু'টো দু'টা করে মোট চারটে ছোট ছোট কামরা। তারপরেই রেলিং-দেওয়া এক ফালি বারান্দা। বাড়িটার পিছনে দক্ষিণে একটুকরো পতিত জমিও আছে বলে মনে হলো। তার একপাশে অষ্টাবক্র মুনির মত একটা ন্যাড়া বেলগাছের নীচে কার একটা কবরের উঁচু ঢিপির ওপরে কে যেন শ্বেতশুভ্র বেলীফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে রেখেছে।

'গোস্ট-হন্টেড' হাউসের আশপাশেও খুব ভালো করে 'ওয়াচ' করতে হয়। দিনের বেলাতেও অশরীরী আত্মার নানা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের সূত্র পাওয়া যায়। তাই চারিদিকে দেখতে দেখতে ওপরে উঠছিলাম। কিন্তু সেই হলঘরে পা দিতেই বীভৎস আর করুণ একটা দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ভেতরে যেতে আর পা উঠল না।

বেশ মোটাসোটা চেহারার একটা মেয়ে। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স হবে। পরনে খাকির হাফপ্যাণ্ট। গায়ে গেঞ্জী। কালো কেউটের বাচ্চার মত ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল দুলছে ঘাড়ের ওপরে। গায়ের গেঞ্জীর ওপরে কোমরে দুই তিনটা বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা আছে তার প্যাণ্ট। তার সেই উদ্বেল যৌবনভরা দেহে সেই অপ্রতুল বেশবাস প্রায় নগ্নতারই সামিল বলা যায়। পাঁচ-ছয়জন শক্তসমর্থ জওয়ান পুরুষও

তাকে ধরে রাখতে পারছে না। তাদের কাউকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে, কাউকে দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিচ্ছে। মত্ত একটা হস্তিনীর মত সে কী শক্তি! আর দু'হাতে বুক চেপে ধরে মর্মান্তিক আক্রোশে চিৎকার করে কাকে যেন গালাগাল করছে—বদ্‌তমিজ, উল্লু—কামিনা কাঁহাকা—হঠাৎ সি ড়ির মুখে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে ছুটে এসে এমন করে আমাকে লাথি মেরে বসল যে আমি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যেতাম। কিন্তু কোন রকমে রেলিং ধরে ফেলে নিজেকে সামলে নিলাম। রোজী খিলখিল করে হেসে বলল, রাইটলি সার্ভড—বলেই আবার দাঁতে দাঁত চেপে ধরে পারসী ভাষায় গাল দিতে শুরু করল—গুরজকী বাচ্চা (শুয়োরের বাচ্চা), সাগিহার (কুকুর), বদজাত কাঁহাকা—

—এই রোজী, কাকে কি বলছিস এসব—চিৎকার করে বলল তার দাদা। রোজী তাকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মারতে ছুটল। পাড়াপ্রতিবেশীরা পিছন থেকে জাপটে ধরে তাকে কোনরকমে নিরস্ত করল। আমি আর তার সামনে যেতে সাহস করলাম না। রোজীর দাদা কুণ্ঠিত হয়ে বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না স্যার—

—না—না—ও কি আর ইচ্ছে করছে! শুনুন আমার কতগুলো জিজ্ঞাস্য আছে।

—বলুন।

—আপনার বোনকে উর্দু কি পারসী কখনো শিখিয়েছিলেন?

—না। এদেশী কোন ভাষাই আমরা শেখা প্রয়োজন মনে করি না—আমাদের সোসাইটি—

—চুপ করুন—যা জিজ্ঞাসা করেছি তার বাইরে কোন বাড়তি কথা বলবেন না।

—সরি স্যার।

—উর্দু এবং পারসী ভাষায় তাহলে কথা বলছে কবে থেকে?

—ওর এই অ্যাবনর্ম্যাল অবস্থা হওয়ার পর থেকে।

—কোন সময়ে সে একটু শান্ত থাকে?

—সন্ধ্যার ঠিক আগে।

—কাদের ওপরে ও বেশি অত্যাচার করে?

—বলেছি তো, বুড়োদের ওপর দারুণ আক্রোশ। সামনে পেলেই আঁচড়ে কামড়ে একেবারে রক্তারক্তি করে দেয়।

—আচ্ছা—এখন যাচ্ছি বুঝলেন, রোজীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললাম—সন্ধ্যার আগে আসবো।

বাড়িতে ফিরে এলাম রোজীর কথাই ভাবতে ভাবতে। ছাব্বিশ বছর বয়স। আনম্যারেড। সেকস পারভারশান? কোন ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা? না—তাহলে তো ডিরেঞ্জমেণ্ট অফ ব্রেন হতে পারতো; হতে পারতো হিস্টিরিয়া, হতে পারতো আরও কত কি—কিন্তু যে ভাষা সে কোনদিন জানে না—সেই ভাষায় অনর্গল গালাগাল করছে কেমন করে! কেন বুড়োদের ওপরেই তার অত রাগ! সব মিলিয়ে কেমন দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মত মনে হতে লাগল আমার।

আমি সাইক্রিয়াট্রিস্ট। মনোবিজ্ঞানী। কোন মুসলমান দরবেশ কি ফকিরের আত্মা মেয়েটির ওপরে ভর করেছে এটা বিশ্বাস করতে মন চায় না। রোজীর মত বয়সের মেয়েদের কি কি কারণে মানসিক বিপর্যয় হতে পারে তা নিয়ে একটু পড়াশুনাও করলাম। আকস্মিক কোন আঘাত, কোন হতাশা—সচরাচর যেসব কারণে মনের স্থিরতা নষ্ট হয়ে যায়, তাছাড়াও ডক্টর ক্যামিলে ফ্ল্যামারিয়ন (Dr. Camille Flammarion) সুবিখ্যাত এক স্পিরিচুয়্যালিস্ট বলেছেন *—যদি কোন বাড়িতে কোন ব্যক্তি অতৃপ্ত ভোগবাসনা নিয়ে মারা যায় তাহলে তার প্রেতাত্মা সেই বাড়ির বয়স্থা মেয়েকে নানাভাবে উৎপীড়ন করে থাকে—এই কথাটিরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, আমাদের দেশের বিখ্যাত থিয়োসফিস্ট ডক্টর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের+ এই উক্তির ভেতরে—তীব্র কামনা-বাসনা নিয়ে যদি কেউ মারা যায় তারা প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা কোন কুমারীর দেহে ভর করে তার কামনা চরিতার্থ করে থাকে—

এসব পড়ে মনে হলো রোজীর দাদার কাছে তাদের বাড়ির হিস্ট্রি নিতে হবে।

সন্ধ্যার কিছু আগে তাদের বাড়িতে গেলাম। দেখলাম খুব শান্ত

* Haunted House, Camille Flammarion, P. 64.

+ বেদান্ত ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান, ড. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রহ্মবিদ্যা, চৈত্র, ১৩৪২ সালে প্রকাশিত—পৃঃ ৫৪৬

আর লক্ষ্মী একটি মেয়ের মত রোজী সেই হলঘরের মেঝেতে একটি সুদৃশ্য গালিচা বিছিয়ে নিচ্ছে। তারপর পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে এমন হাবভাব করতে লাগল যেন মনে হলো সে বুঝি নামাজ পড়বে। যা ভেবেছি ঠিক তাই। রোজী গম্ভীর কণ্ঠে নির্ভুল উচ্চারণে আজান দিতে লাগল—

আল্লাহু আকবর

আশহাদু আল্‌লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌

আমি ইশারায় রোজীর অগ্রজকে ডাকলাম। বললাম—আচ্ছা এই বাড়ি কি আপনারা কিনেছেন ?

—হ্যাঁ স্যার—এটা কেনা বাড়ি। বছর দশেক হলো আছি।

—এই বাড়িতে কেউ কি কখনো অপঘাতে মারা গিয়েছে ?

—বলতে পারবো না স্যার—আমরা এখানে আসার আগে যদি কিছু হয়ে থাকে—

আশ্‌হাদু আল্‌লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌···

রোজী তন্ময় হয়ে ওস্তাদ মুয়াজ্জীনের মতই আজানের সুর গেয়ে চলেছে।—আমাকে এই মুহূর্তে একটা কোরান এনে দিতে পারেন ? চাপা গলায় ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললাম তার দাদাকে। ভদ্রলোক ছুটল বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে এক মুসলমান দরজির দোকানে। কয়েক মিনিট পরে মুখ ভার করে ফিরে এল সে। বলল, স্যার কোন হিন্দুর হাতে কোরান দেবে না দরজি।

আমি মোটেই হতাশ হলাম না। সৌভাগ্যক্রমে কোরানের দু'একটা আয়াত্‌ (শ্লোক) আমার মুখস্থ ছিল। আমি স্থির দৃষ্টিতে রোজীর দিকে তাকিয়ে সুর করে আবৃত্তি করতে শুরু করলাম—

আইন্না জাহান্নমা লামোহীতাতোম বেল কাফেরীন য়্যাওমা য়্যাগশা গলত্‌ হ্যায়—

মেয়েটি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—তল্‌ফুজ (উচ্চারণ) বিলকুল খারাব্‌।

—আপকা কহ্‌না সহী হ্যায় (অর্থাৎ আপনি ঠিকই বলেছেন), আমি হেসে বললাম।

—ফির বোলো ফির বোলো, মেয়েটির কণ্ঠে অনুনয় ফুটে উঠল। আমি আবার কোরানের আয়াত্‌ আওড়াতে শুরু করলাম—

হ্মোল আজাবো মেন্

ফাওকোহিম অমেন তাহ্তে আর জোলাহিম অয়্যাকুনো জুকু···

—সাবাস্ তুম্ হিন্দুকা লড়কা কোরান শরিফ পড়নে কা ভি সওক্ রাখতে হো—বলতে বলতে খুশীতে ভেঙে পড়ে এই প্রথম আমাকে বসার জন্য একটি চেয়ার এগিয়ে দিল আর নিজেও একটা চেয়ারে বসল। আমার মুখোমুখি বসে স্নিগ্ধ গলায় বলল, আয়াত্ বলিয়ে জী—

—কো-তেবা আলায়-কুমোল-কেতা লো-অহুঅ কোরহোল্লা-কম্— আমি বলে চলেছি আর সে ক্রমশঃ আমার কাছে একটু একটু করে সরে এসে একেবারে আমাব হাঁটুর সঙ্গে তার দুই হাঁটু লাগিয়ে এমন করে বসল যেন সে আমার কত কালের অন্তরঙ্গ—আপনজন। আমি একটার পর একটা আয়াত্ বলছি আর সে বাঁশির স্বরে মুগ্ধ সাপিনীর মত ডাইনে বাঁয়ে দুলছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, নিবিড় একটা অনুভবের সুখে সে যেন আবিষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি এইবার কঠিন গলায় প্রশ্ন করলাম—আপনি এদের ওপর এত ক্রুদ্ধ হয়েছেন কেন ?

—মেয়েটি একটি জঘন্য অন্যায় করেছে—তার উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে ওকে ছাড়বো না।

—কী অন্যায় জানতে পারি কি ?

—আমি বারান্দার নীচ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দোতালা থেকে অপবিত্র বস্ত্রখণ্ড (মেয়েদের গভীর লজ্জার যে জিনিস তারা সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখে) আমার মাথার ওপর ফেলেছে।

—নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধ। কঠিন শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু বুদ্ধাদের ওপর আপনার এত আক্রোশ কেন ?

—এই নোংরা জিনিস যেখানে-সেখানে ফেলতে নেই সেটা তো সাধারণতঃ বর্ষীয়সী মেয়েরাই শেখায়—এই বাড়ির প্রাচীনারা ওকে তা শেখায়নি কেন ?

—ঠিক কথা। এবারে আপনাকে একটা কথা বলবো ?

—বোলো বেটা।

—আপনি জ্ঞানী ও মহৎ—আপনি অশরীরী—আপনাকে তো মেয়েটি দেখতে পায় নি !

কোন কথা বলল না সেই বিদেহী আত্মা। অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতায়

থমথম করতে লাগল সেই হল-ঘর। শুধু আবছায়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই ঘরের দূর কোণ থেকে একটা পোকা ডেকে উঠল—চিপ্-চিপ্-চিপ্—

—হয়তো দেখতে পায় নি। কিন্তু এমন অপবিত্র জিনিস তো রাস্তা-ঘাটে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াও যে ঠিক নয় সেটা বোঝার মত বয়স নিশ্চয়ই মেয়েটির হয়েছে!

—আপনি ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি এদের দোতলার বারান্দার নীচ দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন ?

—ওদের বাড়ির পিছনে কবরখানাটা লক্ষ্য করেছো—ওই সমাধিভুমির গেটের বাঁদিকে যে নতুন কবরটা দেখছো— ওইটিই আমার কবর। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওই কবর থেকে বেরিয়ে আমি মসজিদে নামাজ পড়তে যেমন যাই তেমনি সেদিনও যাচ্ছিলাম।

—সত্যি স্বীকার করছি, খুবই অন্যায় করেছে মেয়েটি। আচ্ছা ওর এই অপরাধের কি ক্ষমা নেই ?

—ক্ষমা ? মেয়েটি যে 'গুনাহ' (দোষ) করেছে তাতে কোনদিনই ওকে মাফ করতাম না। কিন্তু আমি তোমাব ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই তোমার অনুরোধে এবারের মত ওকে ক্ষমা করলাম। ভালো কবে বলে দাও এইরকম অপকর্ম আর যেন না করে—হঠাৎ থেমে গেল সেই বিদেহী আত্মা। আবার বলল, আব শোনো, এই বাড়ির প্রত্যেকটি লোক সকলে মিলে যেন পর পর সাতদিন আমার সমাধিতে চেরাগ (প্রদীপ) জ্বালিয়ে দেয় এবং নতজানু হয়ে কুর্নিশ এবং ক্ষমা ভিক্ষা করে।

বলাবাহুল্য কোন অশরীরী আত্মা রোজীর মুখ দিয়েই কথাগুলো বলছিল। তার শেষের দিকের কথাগুলো নিস্তব্ধ ঘরে কেমন গমগম করে উঠল আর যেন কঠোর আদেশের মত শোনালো। সে আবার যেন বহু—বহু দূর থেকে বলল, আমি এখন চললাম—আমার কথামত যদি কাজ না হয় তাহলে কিন্তু জেনে রাখবে দ্বিগুণ শাস্তি পাবে।

দমকা একটা ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে এল। দূরে সেই ন্যাড়া বেলগাছটার ডালগুলো থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। রোজী শান্ত আর পাথুরে একটা মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

সেদিন থেকে সাতদিন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারটি সেই প্রেতাত্মার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। রোজী সুস্থ আর স্বাভাবিক

হয়ে গিয়েছিল। আর রুদ্ধ, বিক্ষুব্ধ সেই প্রেতাত্মার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল এণ্টালির পুলিস হসপিট্যাল রোডের সেই দোতালা বাড়ি।

রোজীর দাদা এবং তাদের প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিলাম, পীর শাহ আতাউল্লা নামে এক ধার্মিক মুসলমান নাকি কিছুদিন আগে গত হয়েছেন। তিনি দীর্ঘকাল এই অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। এণ্টালির পুলিস হসপিট্যাল রোডের শেষপ্রান্তে কবর-ভূমিতে যে নতুন সমাধিটি আছে সেটি সেই পীর ফকির শাহ আতাউল্লার। কে জানে হয়তো তাঁরই বিদেহী আত্মা রোজীদের দোতলার নীচ দিয়ে মসজিদে নামাজ পড়তে যেত।"

এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে ডক্টর বসু মন্তব্য করেছেন—কিন্তু সত্যিই কি মৃত কোন ব্যক্তির আত্মা জীবিত কোন ব্যক্তির দেহে ভর করতে পারে?

থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী সুবিখ্যাত থিয়োসফিস্ট মাদাম ব্লাভট্স্কি তাঁর লেখা 'ইসিস আনভেইল্ড সিক্রেট ডকট্রিন' (Isis unveiled Secret Doctrine) বইতে বলেছেন—পরলোকগত কোন ব্যক্তির আত্মা জীবিত কোন লোকের দেহে প্রবেশ করতে পারে—একে 'পরকায়া প্রবেশ' বলে। তারপর শ্রীযুক্তা ব্লাভট্স্কি পরকায়া প্রবেশ কি কি ভাবে ঘটতে পারে তার যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন—সে-সব এখানে অবান্তর। মৃত ব্যক্তির আত্মা যে জীবিত ব্যক্তির ওপর ভর করে—করতে পারে—সেটাই মূল কথা।

এখানে উল্লেখযোগ্য, পীর ফকিরের অশরীরী আত্মা কিন্তু আংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারটিকে 'সিভিক সেন্স' শিক্ষাই দিয়েছে। প্রেতাত্মা যে শুধু অনিষ্টকারীই হয়—তা নয়—সে কখনও কখনও মানুষের কল্যাণকামীও যে হয়, প্রেততত্ত্ববিদ্ ইলিয়ট ওডোনেলের (Mr. Elliot O'donnel) 'Ghost Helpful and Harmful' বইটিতে বর্ণিত অত্যাশ্চর্য ঘটনার ভেতরেই তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে—

নিশি রাত থমথম করছিল। লরা তার ঘরের ভেতরে উত্তেজিত পায়ে পায়চারি করছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে তাকালো খোলা জানালা দিয়ে বাইরে। জ্যোৎস্নায় চারিদিক দিনমানের মত ফুটফুট করছে। এই সুন্দর পৃথিবীতে আজ তার শেষরাত। কি হবে আর বেঁচে থেকে?

ম্যাকেঞ্জি তাকে 'বিট্রে' করেছে। তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল সে! অথচ ওই ম্যাকেঞ্জিকে ঘিরে সে একদিন কত স্বপ্নের রঙিন জাল বুনেছিল। তাকেই বিধাতা ছিনিয়ে নিল। কেন—কার কাছে কি অপরাধ সে করেছে? নিদারুণ একটা যন্ত্রণা যেন তাকে শতমুখ দিয়ে বিদীর্ণ করতে লাগল। সে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে কি যেন একটা সংকল্প করল।

বড় ভয়ানক সেই সংকল্প।

সে দৃঢ়পায়ে এগিয়ে গেল তার বিছানার দিকে। বালিশের নীচ থেকে বের করল একটা ক্ষুব—তার দাদার দাড়ি কামানো ক্ষুর। যেই সেই ক্ষুরটাকে তার গলায় বসাতে যাবে অমনি লরা থরথর করে কেঁপে উঠল। আর ঠাণ্ডা—খুব ঠাণ্ডা—হিমশীতল জলের একটা স্রোত যেন বয়ে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। আর কে যেন অদৃশ্য হাতে মত্ত হস্তীর মত শক্তিতে তার হাতটা চেপে ধরল। সে চীৎকার করে উঠল—কেন—কেন তুমি আত্মঘাতী হচ্ছো—তুমি—তুমি কি জানো না লরা—আত্মহত্যা মহাপাপ—

—সে কীরে, কার সংগে তুই কথা বলছিস? পাশের ঘর থেকে ছুটে এল তার দাদা, মা এবং বাড়ির আরো অনেকে। তার মা আতংকে চিৎকার করে উঠল— লরা, তুই কি ক্ষুর দিয়ে—

—লরা, আমার আয়ু ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই আমি চলে এসেছি। তুমি—তুমি আমাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করো, আর কাউকে বিয়ে করে সুখী—

—লরা, এসব কি বলছিস মা?

—চুপ করো মা, ম্যাকেঞ্জির স্পিরিট ওর ওপর ভর করেছে। চাপা উত্তেজিত গলায় বলল লরার দাদা—দেখছ না ওর চোখমুখ। ওর মুখ দিয়ে ম্যাকেঞ্জিই বলছে কথাগুলো।

এমনি করে সেই রাত্রে নিশ্চিত এবং অনিবার্য মৃত্যু থেকে লরাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল তারই পরলোকগত প্রেমিকের বিদেহী আত্মা।

আকাশবাণীর গারষ্টিন প্লেসের পুরানো বাড়িতে ছিল প্রেতের আনাগোনা। স্টুডিও'র কাচের দরজার ওপারে লম্বা ঢ্যাঙা চেহারার যে সাহেবের ছায়ামূর্তি দেখা যেত তার সংগে কি আদি যুগের রেডিও'র কোন যোগাযোগ ছিল?

রাত তখন দশটা।

নিঝুম হয়ে গিয়েছে অফিসপাড়া। জনহীন নির্জন রাস্তায় দু'একটা প্রাইভেট কার হুসহাস শব্দ তুলে দূরে অন্ধকারে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ভূতুড়ে অন্ধকার গায়ে মেখে বড় বড় বাড়িগুলো এক একটি অতিকায় দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাস্তার আলোগুলো মরা শকুনের ঘোলা চোখের মত জ্বলছে।

গারস্টিন প্লেসের সেই তিনতলা অফিস বাড়িটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই রাত আটটায়। কিন্তু দোতলার হলঘরের পাশের চেম্বারে আলো জ্বলছিলো। সেখানে এক অফিসার ঘাড় গুঁজে একমনে কাজ করছিল। বাইরে টুলের ওপরে বসেছিল বেয়ারা মেহেরবান। কখন সাহেবের কাজ শেষ হবে—কতক্ষণে সে এই অফিস বাড়িরই নীচের তলায় তার ডেরায় গিয়ে জিরোতে পারবে—এইসব ভেবে ভেতরে ভেতরে সে অস্থির হয়ে উঠছিলো। তার মনে হলো, সাহেবের বোধ হয় টাইমের হুঁশ নেই! সে কি মনে করিয়ে দেবে? না, গোস্তাকি হোবে?

—মেহেরবান—নিস্তব্ধ বাড়িতে অফিসারের তীক্ষ্ণ গম্ভীর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে দূরে বাতাসে মিলিয়ে গেল। ছুটে এসে মেহেরবান সুইং-ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে বলল—ফরমাইয়ে হুজুর!

—আভি বন্ধ করো, ময় জা রহা হুঁ—বলেই অফিসার ভদ্রলোক বেরিয়ে গেল। আর একটু পরেই বহুকালের পুরানো সেই অফিসবাড়ির প্যাঁচানো কাঠের সিঁড়িতে তার জুতোর শব্দ বাজতে লাগল—খট-খট-খট্—সেই শব্দটাও চক্রাকারে পাক খেয়ে খেয়ে ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল।

সেই অফিসার যখন সিঁড়ির শেষ ধাপে, তখন এল বাধা।

—হ্যালো—আর ইউ গোয়িং? দোতলার কাঠের রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন অফিসের বড়কর্তা স্টেপলটন সাহেব। সিঁড়ির সেই স্বল্প

আলোতেও তাঁর রাঙা লাল টকটকে মুখখানা আগুনের একটা ভাটার মত জ্বলছে। দ্রুত পায়ে অফিসার ওপরে উঠে গিয়ে বলল, স্যার, কোন ভুল-চুক হয়েছে না কি ?

—তোমাকে তো বলেছি আমাদের ইনস্টিটিউশনের এখন গ্রোয়িং স্টেজ—এই সময় তোমাকে একটু বেশি খাটতে হবে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অফিসার বড় সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—তোমাকে বলিনি বম্বের ফাইলটা বাড়িতে নিয়ে যেতে ?

—ওঃ সরি স্যার—এক্সট্রিমলি সরি স্যার—ফাইলটা নিয়ে যাবো বলে আমার টেবিলের সামনে রেখেছি, আসার সময় একেবারে ভুলে গিয়েছি—বলেই মেহেরবানকে বলল অফিসার—যাও তো, আমার টেবিলের একেবারে সামনে যে ফাইলটি আছে সেটা নিয়ে এস।

—আচ্ছা হুজুর অখুনি লিয়ে আসতেছি—ছোকরা মেহেরবান ছুটল দোতলায়। স্টেপলটন আর অফিসার তাঁদের নতুন প্রতিষ্ঠানের কাজের গতিপ্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে টুকরো টুকরো আলাপ-আলোচনা করতে লাগলো। অফিসারের মনে হলো, মেহেরবান এখনও আসছে না কেন ! দোতলার ঘর থেকে একটা ফাইল নিয়ে আসতে কতক্ষণ লাগে ?

দুম—কাঠের ওপর খুব ভারী জিনিস পড়লে যেমন শব্দ হয় তেমনি একটা আওয়াজ হলো হঠাৎ। হোয়াট'স দ্যা ম্যাটার ! স্টেপলটন বিস্মিত হয়ে অফিসারের দিকে তাকালেন। কিন্তু তাঁরা দু'জনে ছুটে ওপরের দিকে যেতে না যেতেই আবার কাঠের সিঁড়িতে আওয়াজ হলো—দুম-দুম। গোটা অফিস বাড়িটা থর থর করে কেঁপে উঠল। আর একটা করুণ আর্তনাদ শোনা গেল—হা—আল্লা—আ—আ—আ— ! বুকফাটা সেই আর্ত চীৎকারে চারিদিকের সেই নিথর স্তব্ধতা যেন আড়ষ্ট ব্যথায় শিউরে উঠল। স্টেপলটন আর সেই অফিসার ছুটে ওপরে কয়েক ধাপ যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দোতলা থেকে সিঁড়ি যেখানে পাক খেয়ে নীচে নেমে গিয়েছে সেই কার্ভিং-এ কাটা একটা গাছের মত পড়ে রয়েছে মেহেরবান। তার চোখদু'টো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে !

—কি ব্যাপার, কি হয়েছে মেহেরবান ?

—হামি আর নোকরি করবো না হুজুর—আর নোকরি করবো না—

—কি হয়েছে বলবে তো !

অনেক কষ্টে কোনরকমে চিঁচিঁ করে ভাঙা ভাঙা হিন্দী বাংলা মিশিয়ে মেহেরবান যা বলেছিল তা এখানে সংক্ষেপে বলা হলো—

সে তর্‌তর্‌ করে দোতলায় উঠে এসেছিল। অফিসারের চেম্বারের সামনে আসতেই সে একটু অবাক হলো। ভেতরে আলো জ্বলছে কেন? সে তো সুইচ্‌গুলো অফ করে দিয়েছিলো মনে হচ্ছে। যাক, হয়তো ভুল হতে পারে। কিন্তু সুইং-ডোর ঠেলে ভেতরে যেতেই—এই পর্যন্ত বলেই সে থেমে গেল। তার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। তার দু'চোখে আতঙ্কের ছায়া কাঁপতে লাগল থর থর করে।

—থামলে কেন মেহেরবান—কি দেখেছিলে?

—সাহেব, দরোয়াজা খুলেই দেখলম কি এক বুঢ্‌ঢা সাহেব আপকা টেবিল পর মাথা নীচ করকে কাম করতেছে হুজুর। হামি যাইতেই হামার দিকে তাকাইল—গর্তে ঢোকা চোখদু'টো কেমন ঘোলা ঘোলা—বুঢ্‌ঢা সাহেব যেন গোরস্থান থেকে উঠে আসছে হুজুর—হামি ছুটে তিন চারঠো সিঁড়ি টপকে নামতে গিয়ে এখানে পড়িয়ে গিয়েছি হুজুর—বলেই স্টেপলটন সাহেবের পাদু'টো জড়িয়ে ধরে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল মেহেরবান, সাহেব হামাকে ছুটি দিয়ে দিন—হামি ঘর যাবে—ঘর যাবে হুজুর। চারদিকে নিথর স্তব্ধতার ভেতরে তার কথাগলো কেমন করুণ কান্নার মত শুনোলো।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর। কিন্তু কোথায় ঘটেছিল, সেই তিনতালা বাড়িতেই বা কিসের অফিস ছিল, অফিসার ভদ্রলোক কে—সেসব বৃত্তান্ত জানতে হলে যেতে হবে পঞ্চাশ বছর আগেকার শহর কলকাতায় ডালহৌসি স্কোয়ারে অর্থাৎ আধুনিক কালের বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগে।

তখনকার দিনের ডালহৌসি স্কোয়ার আজকের মত এত জমজমাট ছিল না। তখনো কলকাতার আদিকালের ইংরেজদের প্রিয় ট্যাঙ্ক স্কোয়ার অর্থাৎ লালদীঘির মনোরম উদ্যানটাকে তছ্‌নছ্‌ করে দিয়ে তার গায়ের ওপরে বেত্রাঘাতের দাগের মত ট্রাম লাইন* বসেনি। আকাশ ফুঁড়ে ওঠেনি

* লালদিঘির বাগানের বাইরে চক্রাধারে ট্রামের লাইন বসানো হয়েছিল আনুমানিক ১৯০৮ সালে। ১৯০২ সালে ইলেকট্রিক ট্রাম চালু হয়েছিল কলকাতায়। তার আগে কিছুদিন চলতো স্টীমে।

(Homa's Annual Calcutta, P. 80)

টেলিফোন ভবনের বিশাল স্কাইস্ক্র্যাপার। রিজার্ভ ব্যাংকের নতুন বাড়িও হয়নি। সেই সময় হেয়ার স্ট্রীট ধরে স্ট্র্যান্ড রোডের দিকে যেতে বাঁদিকে যে সংকীর্ণ গলিটা বেরিয়ে গেছে, ঐতিহাসিক সেই পথটি কোম্পানির এক কৃতী এঞ্জিনীয়ার, টাউনহলের নির্মাতা কর্নেল গারস্টিনের পুণ্যস্মৃতি বহন করছে।

গারস্টিন প্লেস।

১নং গারস্টিন প্লেসের একনম্বর বাড়িতেই আধুনিক কালের আকাশবাণী কলকাতার জন্ম হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে (১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ)। উপরোক্ত এই ভূতুড়ে কাণ্ডটা ঘটেছিল এই বাড়িতে। অফিসার ভদ্রলোকটির কথা যথাস্থানে বলা হবে। এই ঐতিহাসিক বাড়িটি যে বহুকথিত ভুতুড়ে বাড়ি তা প্রমাণিত হয়ে যাবে, আরও কয়েকটি রোমাঞ্চকর অলৌকিক ঘটনার ভেতর দিয়ে। এই বাড়িতে রহস্যময় ছায়ামূর্তির আনাগোনার সঙ্গে কলকাতা বেতারের জন্মলগ্নের কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে বলেই হাজারো বাধাবিপত্তি, হতাশা আর দীর্ঘশ্বাসে কণ্টকিত অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র জন্মের সেই বিচিত্র ইতিহাস নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ভূমধ্যসাগরের নীল জলের উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে চলেছিল ইটালিয়ান একটা ক্রুজার। কেন যেন তার কাপ্তেন-ক্রু-খালাসী-সারেংদের চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা জ্বলজ্বল করছিল। কাপ্তেনের কেবিনের এক কোণে একটা জটিল যন্ত্রের সামনে কানে হেডফোন লাগিয়ে বসে একটা লোক কি যেন শোনার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সে শুনতে পেল—হ্যালো—হ্যালো—নেপলস পোর্ট থেকে বলছি—উল্লাসের সাড়া জাগল জাহাজে। শত শত মাইল দূরে থেকে ওয়ারলেসে তাহলে কথা বলা সম্ভব! ১৮৯৭ সালের এই ঘটনাটির ভেতরেই রেডিও'র ভ্রূণ নিহিত ছিল। তার পনের বছর পর (১৯১২) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টিম ন্যাভিগেশান কোম্পানি তাদের জাহাজগুলোতে বেতার-যন্ত্র বসিয়ে ভারত মহাসমুদ্রে পাড়ি দিতে লাগল। এই কোম্পানিই হেস্টিংস স্ট্রীটে ওয়ারলেসের একটি অফিস খুলল তার ছয় বছর পরে (১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে)। অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র ইতিহাসে আছে, It will be interesting to note that British India Steam Navigation Company first installed Broadcasting

transmitter in 1923. যে ব্রডকাস্টিং ট্র্যান্সমিটার তারা বসিয়েছিল তার নাম ছিল—"5. A. F."

শহর কলকাতাকে তিল তিল করে তিলোত্তমা সাজিয়েছিল যারা, গঙ্গার ধারে সুতানুটি গ্রামের তাঁতীদের খানকয়েক চালাঘর, গোবিন্দপুরের বাঘ-ভালুক আর বুনো শুয়োর অধ্যুষিত ঘন জঙ্গল আর কলকাতার এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা গোটাকয়েক মাটির কোঠা-বাড়িকে যারা নিরলস পরিশ্রমে ইন্দ্রপুরীতে রূপান্তরিত করেছিল, সেই ইংরেজদের চোখে স্বপ্ন নেমে এল—ডাঙায় বসে ওয়ারলেস যন্ত্রের মাধ্যমে যদি ঝড়ের খবর দূর-দূরান্তরের বন্দরে বন্দরে পাঠানো সম্ভব হয় তাহলে গান-বাজনা-নাটক-কথিকাই বা কোন ব্রডকাস্টিং স্টেশন থেকে দেশ-দেশান্তরের শহরে-জনপদে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে না কেন ? তারা খুলে ফেলল দেশের দুই প্রান্তে দুইটি বেতার কেন্দ্র—বম্বে ও কলকাতা।

গড়ে তুলল একটা কোম্পানি—ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি (১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৯৩০ সালে এই কোম্পানিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করল ভারত সরকার। ১৯৩৬ সালে হলো তাব নতুন নামকরণ—অল ইণ্ডিয়া রেডিও।

কলকাতা কেন্দ্রের প্রথম ডিরেক্টার হলেন ওয়ালিক সাহেব (P. Wallic)—আর বম্বে স্টেশনের ভার নিলেন ডমস্টন। শুরু হলো আকাশবাণীর কাজ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য জেনারেল পোস্ট অফিসের ঘড়িওয়ালা যে বিশাল বাড়ির জমিটায় ইংরেজরা তৈরি করেছিল তাদের প্রথম কেল্লা—ফোর্ট উইলিয়ম; আর তারই পাশে ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের (ডালহৌসি) বাঁদিকে গড়ে তুলেছিল তাদের শাসন-যন্ত্রের কেন্দ্র—রাইটার্স বিল্ডিং (১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) অর্থাৎ যে তল্লাটে ইংরেজদের হাতে শহর কলকাতার জন্ম, ঠিক সেইখানেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল অল ইণ্ডিয়া রেডিও।

গারস্টিন প্লেসের বাড়িতে রেডিও'র কাজ চলছে। কর্মীদের চোখেমুখে খুশীর আলো ঝকমক করে। বেতারের মাধ্যমে তারা ঈথারে ছড়িয়ে দিচ্ছে গানের মধুর সুরেব মূর্ছনা। কিন্তু যেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে অমনি তাদের মুখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। ভূতুড়ে বাড়ি। কখন যে কোন অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ঘটবে কে জানে!

একদিন রেডিও'র কর্মচারীরা কাজে এসেই জানতে পারল বিগত রাত্রির চাঞ্চল্যকর একটা ঘটনার কথা। শুধু তাই নয়। মামলা গিয়ে পেঁাচেছে একেবারে খোদ বড় সাহেবের ঘরে। অতি উৎসাহী যে কয়েকজন কর্মী কৌতূহলী হয়ে স্টেশন ডিরেক্টরের ঘরে গিয়েছিল তাদেরই একজনের বক্তব্য এখানে বলা হলো—

ওয়ালিক সাহেব চুপচাপ গম্ভীব হয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে রেডিও'র বাড়ির কেয়ার-টেকার জগমোহন। বিহারী। মাঝবয়সী। বেঁটেখাটো শক্তসমর্থ চেহাবা।

জগমোহন ভাঙা ভাঙা বাংলা আর হিন্দী মিশিয়ে তার যে অভিজ্ঞতা বলেছিল তা যেমন বিচিত্র তেমনি রোমাঞ্চকর।

সে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে সিঁড়ির নীচে খাটিযায় ঘুমোচ্ছিল, রোজ যেমন ঘুমায়। হঠাৎ মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে স্পষ্ট শুনতে পেল—কাঠের সিঁড়ি দিয়ে বুটজুতো পরে নামলে যেমন শব্দ হয় তেমনি আওয়াজ—খট্—খট্—খট্—খট্। সিরসির করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। বাবুরা যে বলে—রেডিও'র এই বাড়ি জিন-পরীদের কুঠি, তাহলে কি তারাই কেউ—কিন্তু যদি কোন চোর-ডাকু কি বদমায়েস আদমী হয়? কত দামী যন্ত্রপাতি আছে। অতএব 'রাম নাম' জপতে জপতে লাঠিটা নিয়ে ওপরে গেল। দেখে এল একেবারে তিনতলার সিঁড়ি পর্যন্ত। কোথাও কেউ নেই! কিন্তু—

ঘোরানো সেই কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একতলার কাছাকাছি কয়েক ধাপ আসতেই সে স্পষ্ট দেখল, শেষরাতের ঝাপসা অন্ধকারে শবদেহবাহী খাটকে যেমন বহন করে নিয়ে যায় প্রেতলোকের ছায়ামূর্তির মত শ্মশান-বন্ধুরা, তেমনি তার খাটিয়াটাকে কয়েকটা ছায়াদেহ টেনে নিয়ে চলেছে ওপরে। ভয়ে, আতঙ্কে, উত্তেজনায় সে চিৎকার করে ডাকল দারোয়ানদের—ধনিয়া—জ-য়-না-রায়ণ। নিশিরাতের নিস্তব্ধ সেই বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে ঠোকর খেয়ে তার প্রতিধ্বনি যেন তাকে ব্যঙ্গ করল—জ-য়-না-রা-য়ণ—অ—অ—অ—তার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। আর চোখের সামনে ঘনিয়ে এল পুঞ্জপুঞ্জ অন্ধকার! তারপরে সে আর কিছু বলতে পারে না।

—স্যার, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, ইউরোপিয়ান প্রোগ্রামের ইনচার্জ

পুরোদস্তুর সাহেবী মেজাজের মানুষ মি. ব্যানার্জী ডিরেক্টারের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, জগমোহন নেশাটেশা করে বোধ হয়। হয়তো গাঁজার মাত্রাটা—

একটা কথাও বললেন না ওয়ালিক সাহেব। তাঁর মুখখানা কেমন গম্ভীর আর কঠোর হয়ে উঠল। অদূরে সেণ্ট জন চার্চের চুড়ো আর শহর কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নকের সমাধিমন্দিরের দিকে চোখ দু'টো ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, নো—নো মি. ব্যানার্জী। শুনেছি—কলকাতার আদি যুগে রেডিও'র বাড়ির এই জমির ওপরে নাকি 'সিমেট্রি' অর্থাৎ গোরস্থান ছিল—

মি ওয়ালিক কোন 'সোরস' থেকে একথা শুনেছিলেন তা তিনি বলেন নি। কিন্তু তাঁর কথার ঐতিহাসিক সত্যতার আভাস পাওয়া যায় "প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়ের" লেখক হরিহর শেঠের এই উক্তির * ভেতরে—"জব চার্নকের কলিকাতা প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে বর্তমান সেণ্ট জন গীর্জার পার্শ্ববর্তী স্থানে সাহেবদের একটি গোরস্থান ছিল। উহা তখন বনভূমি ছিল। হুগলী ও বালেশ্বরে গমনাগমনের পথে জাহাজে যে সকল ইংরেজের প্রাণত্যাগ ঘটিত তথায় তাহাদের মৃতদেহ সমাহিত করা হইত···"

কে জানে —কে বলতে পারবে—শত শত শতাব্দী পূর্বে গঙ্গার জলে ডুবে অপঘাত মৃত্যুর শিকার হয়েছিল যারা তাদেরই কারো প্রেতাত্মা। দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছিল মেহেরবান। হয়তো তাদেরই নিরবচ্ছিন্ন শান্তিকে বিঘ্নিত করছিল বলেই কেয়ার-টেকার জগমোহনের খাটিয়া ধরে ফেলে দিতে চেষ্টা করেছিল।

আরও একদিন ঘটল আর এক আশ্চর্য কাণ্ড। ইউরোপীয়ান প্রোগ্রামের কর্তা মি ব্যানার্জী যে জগমোহনকে নেশাভাঙ করে বলে ঠাট্টা করেছিল সে নিজেই এমন ভয় পেয়েছিল যে প্রায় আধমরা হওয়ার সামিল হয়ে গিয়েছিল।

উনিশশো প'য়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ সাল হবে। ডিসেম্বর মাসের কোন এক তারিখের ঘটনা। রাত তখন ঠিক সাড়ে নয়টা। শীতের রাত। রেডিও'র বাড়ির চারিদিকে ঘন হয়ে নেমেছে কুয়াশা। পাঁচ নম্বর স্টুডিও'র সামনে করিডরের আলোটা শুধু টিমটিম করে ধোঁয়াটে একটা প্রেতচক্ষুর

*প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়, হরিহর শেঠ, পৃঃ ২৭।

মত জবলছিল। ব্যানার্জী তার প্রোগ্রাম ব্রডকাস্ট অর্থাৎ ইংরেজী গান বাজনার রেকর্ড বাজানো শেষ করে বেরিয়ে এল। অনেকক্ষণ স্টুডিও'র বন্ধ ঘরে আটকে থেকে তার মাথাটা কেমন ভার ভার ঠেকছিল। কয়েক মুহূর্ত সে করিডরে দাঁড়িয়ে রইল। সেণ্ট জন চার্চের কবর-ভূমির ওপর দিয়ে বয়ে-আসা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক শীতল জলের ঝাপটার মত আছড়ে পড়ল তার চোখেমুখে। বেশ 'ফ্রেশ' মনে হলো। শব্দ করে দিয়াশলাই জবালিয়ে মনের সুখে সিগারেট টানতে লাগল। ধীর পায়ে ঝাপসা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিডর দিয়ে লাউঞ্জে এল। সেই খোলা বারান্দার পাশেই চার্চের বাগানে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকা পাম-গাছগুলোর নীচে ঘন অন্ধকারে এক-একটা সমাধি-ফলককে রহস্যময় ছায়ামূর্তির মত মনে হচ্ছে। কেন যেন তার শরীরের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটে গেল অদ্ভুত ঘটনাটা—

লাউঞ্জের রাউণ্ড টেবিলটার চারিদিকে যে চারটি চেয়ার ছিল তার একটা চেয়ার হঠাৎ সশব্দে নাচতে নাচতে তীরবেগে ঘুরে গিয়ে সিঁড়ির দরজার গায়ে ঠোকর খেয়ে কাত হয়ে রইল। ভয়ে শিউরে উঠল ব্যানার্জী। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল আর থর থর করে কাঁপতে কাপতে বসে পড়ল সেই লাউঞ্জেই। গোল টেবিলের ওপরে একটা ফোন ছিল। কোনরকমে সেইখান থেকে সে টেলিফোন করল ডিউটি-রুমে—আপনারা শীগগীর আসুন লাউঞ্জে—আমার অবস্থা—আমি—আমার শরীর খুব খারাপ—

ছুটে এল ডিউটি-অফিসার, এল আরও দু'একজন কর্মী। তাদের কাছে ব্যানার্জী বৃত্তান্তটা বলল। তারাও সবিস্ময়ে দেখল, গোল টেবিল থেকে বেশ কয়েকগজ দূরে সিঁড়ির দরজায় গায়ে তখনো হেলানো অবস্থায় রয়েছে সেই চেয়ারটা।

এই ঘটনার পরেই রেডিও'র কর্মীরা দারুণ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। রাত আটটার পরে আর তারা কেউ একেবারে একলা কোন স্টুডিওতে ডিউটি করতে চাইতো না। কলকাতার একটি বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিকে হেড লাইনে খবরও বেরিয়েছিলো—**A. I. R.—spook frightens employees.** * রেডিও'র কর্মচারীরা কাগজের রিপোর্টারকে যে বিবৃতি দিয়েছিল তার বঙ্গানুবাদ এখানে দেওয়া হলো—

* **Statesman, Monday. 4th Aug. 1958.**

রাত্রে এই বাড়ি যখন নিঝ্‌ঝুম হয়ে যায়, তখন কোন কোন দিন হঠাৎ নজরে পড়ে ধূসর রঙের কোট-প্যাণ্ট পরা লম্বা ঢ্যাঙা চেহারার এক সাহেব নির্জন করিডরে ধীর পায়ে পায়চারি করছে। দৈবাৎ যদি কোন এমপ্লয়ী তার সামনে পড়ে যায় তাহলে সেই সাহেব কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রেডিও'র কর্মীরা স্টাফ রিপোর্টারকে বলেছিল আরও একটি ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা।

এক ইংরেজ মহিলা 'অ্যানাউন্সার' তিনতলার চেম্বারে বসে কাজ করছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল তার চেম্বারের পুরু কাঁচের জানালার পাশেই ফাঁকা স্টুডিওতে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে এক বিদেশী ভদ্রলোক। কাঁচের আড়াল থেকে তার দীর্ঘ বলিষ্ঠ মূর্তি কেমন ঘসা ঘসা ছবির মত মনে হলো। মনে মনে খুব বিরক্ত হলো ডিউটি-অফিসারের ওপরে। কেন যে যখন তখন ওপরে ভিজিটরকে 'অ্যালাউ' করে! একটা গ্রামোফোন রেকর্ড চালিয়ে সোজা নীচে নেমে এসে ডিউটি-অফিসারকে বলল, আপনি কি কোন ফরেনারকে ওপরে যেতে পারমিশান দিয়েছেন?

—না ম্যাডাম।

—স্ট্রেঞ্জ! আমি নিজের চোখে দেখলাম, ফাঁকা ড্রামা-স্টুডিও'র ফ্লোরে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক—

—আপনি একবার দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করুন তো ম্যাডাম—যদি সে কিছু বলতে পারে।

দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল—না মেমসাহেব, কোন সাহেব তো ওপরে যায় নি!

অবাক হয়ে গেল সেই বিদেশিনী ঘোষিকা। শুধু নিজের মনে অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে বলল, তাহলে কি তারই চোখের ভুল—কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম মানুষটাকে!

কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। নেটিভ এমপ্লয়ীরা যে বলে—এই বাড়িটা গোস্ট-হণ্টেড হাউস—তাহলে—তাদের কথাটাই ঠিক! আবার মনটাকে শক্ত করতে চেষ্টা করে ভাবল, নো—গোস্ট-টোস্ট নেটিভদের সুপারস্টিশান—সে ওসব 'বিলিভ' করে না।

আবার চেম্বারে ফিরে এল। স্টুডিও'র ঘড়ির দিকে তাকালো—রাত

দশটা পনেরো। আরও পনেরো মিনিট তার ডিউটি। তার গা-টা কেমন ছমছম করতে লাগল। রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে মাথা নীচু করে বসে রইল। কিন্তু আশ্চর্য, তাকাবে না তাকাবে না করেও যেই স্টুডিও'র দিকে তাকালো তার কিউবিকলসের কাঁচের জানালার ওপারে—দেখল—সেই ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক পাথুরে একটা মূর্তির মত আবার দাঁড়িয়ে আছে। তার মনে হলো লোকটার চোখের কোটরে যেন মণিদু'টো নেই, সেখানে বাইরের রাতের অন্ধকার পাথরের মত চেপে বসে রয়েছে। তীব্র ভয়ে তার হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। সে চিৎকার করে বলল, হু-জ দে-য়া-র ?

রহস্যময় সেই মূর্তির ভেতর কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। যেমন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সে আর থাকতে পারল না। ঝড়ের গতিতে নীচে নেমে এল সে। ভয়ে উত্তেজনায় কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছে তার মুখখানা। তীব্র আতঙ্কের যন্ত্রণায় থরথর কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো গলায় ডিউটি-অফিসারকে বলল –আবার— আবার দেখলাম সেই লোকটাকে—আমি আব ওপরে যেতে পারবো না— বলেই সেই যে রেডিও-স্টেশন থেকে সে বেরিয়ে গেল আর এল না।

এল না তার পরের দিনও। কয়েকদিন পরে এল তার রেজিগনেশান লেটার।

মেহেরবানের এবং মেমসাহেবের সেই বিদেশী ভদ্রলোকের প্রেতচ্ছায়া দেখা কিম্বা লাউঞ্জের সেই চেয়ারটার নাচতে নাচতে ঘুরপাক খেয়ে চলে যাওয়া ইত্যাদি বিস্ময়কর ঘটনাগুলোকে রেডিও-কর্মীদের গালগল্প বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সেই আদিযুগের যে দু'একজন কর্মচারী জীবিত আছেন তাঁরা বলেন—এসব তাঁদের নিজেদের চোখে দেখা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রেতের গতিপ্রকৃতি ও তাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে স্যার অলিভার লজের উক্তি *—**There is no break in the continuity of existence**…অর্থাৎ মৃত্যুর পরে জীবের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। আরও পরিষ্কার করে বলেছেন তিনি—পার্থিব বিষয়ে ভোগবাসনা নিয়ে যারা মারা যায়, তাদের কামনা এবং ভাবনা একই রকম থাকে। বরং মৃত্যুর পর তাদের বাসনার তীব্রতা

* **'Survival of Man', Sir Oliver Lodge, P. 339.**

আরও বাড়ে। কিন্তু—স্থূলদেহ না থাকায় তাদের কামনা চরিতার্থ করতে পারে না বলেই কামনা-বাসনায় মত্ত মানুষের পৃথিবীর চলমান জীবন-স্রোতের পাশে সে ট্যান্টালাসের মতই (ঈশ্বরের অভিশাপে আকণ্ঠ জলে ডুবে থেকেও যে পিপাসা মেটাতে পারে না) ছটফট করে বেড়ায়। স্যার অলিভার লজ তাঁর প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করেছেন একটি আশ্চর্য ঘটনা—

১৯০৪ সালের ৫ই এপ্রিল রোম থেকে কিছুদূরে একটা ছোট শহরের এক হোটেলে বসে পাঁচজন উচ্চপদস্থ মিলিটারি অফিসার যুদ্ধসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা করছিলেন। বাইরে নিশি রাত থম থম করছিল। তাদের কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে মদ্যপানও চলছিল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এল। বিয়ারের বোতলগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাঁরা আবার নতুন বোতল নিয়ে এসে গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢেলে যেই গ্লাসগুলোকে মুখের কাছে তুলতে গেলেন অমনি তাঁদের প্রত্যেকের হাত কেন যেন ভারী—অসম্ভব ভারী ঠেকল। মনে হলো, হাতের ওপর যেন বিশমণী ওজনের পাথর চাপানো রয়েছে। তাঁরা ভয় পেয়ে ছুটে গেলেন হোটেলের ম্যানেজারের কাছে। ম্যানেজার বললেন,—আমার পিতৃদেবের কাছে শুনেছি, চল্লিশ বছর আগে আপনারা যে ঘরে বসেছেন সেই ঘরে কয়েকজন সৈনিক মদ খেয়ে মাতলামি এবং নানারকমের বেলেল্লাপনা করছিল। তাদের অফিসার ছিলেন কড়া ধাতের মানুষ। বদমেজাজী। তিনি তাঁর সৈন্যদের ক্যাম্পে ফিরে যেতে বললেন। সৈনিকরা যেই যেতে অস্বীকার করল অমনি সেই অফিসার গুলি করে তাদের মেরে ফেলেছিলেন। তারপর থেকে স্যার, ওই ঘরটায় কেউ আর থাকতে পারে না।

স্যার অলিভার লজ ইটালির সামরিক দপ্তর থেকে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিলেন, সত্যিই সেই হোটেলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

প্রেততত্ত্ববিদ মহাত্মা শিশিরকুমারও তাঁর হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনেও * অনুরূপ একটি ঘটনার কথা বলেছেন—কাশীর অরবিন্দ নামে এক যুবকের স্ত্রীর সঙ্গে তার শাশুড়ীর বনিবনা হতো না। তাই স্ত্রী রাগ করে তার পিত্রালয়ে চলে গিয়েছিল। মায়ের নির্দেশে অরবিন্দ আবার যেই বিয়ে করল অমনি প্রথমা স্ত্রী এসে ক্ষমাটমা চেয়ে স্বামীর ঘর

* **Hindu Spiritual Magazine, Vol. 4, 1st Part.**

করতে লাগল। কিছুদিন পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করে সে মারা গেল। তার দিন কয়েক পরেই অরবিন্দের মা মৃতা বধূর ছায়ামূর্তিকে বাড়ির উঠোনে পায়চারি করতে দেখতে পেল।

নজীর আছে আরও অনেক।

এখন দেখতে হবে গারিস্টন প্লেসে রেডিও'র বাড়ির নির্জন করিডরে, শূন্য অফিস-ঘরে কোন হতভাগাদের প্রেতাত্মা আনাগোনা করে?

শহর কলকাতার জন্মলগ্নের ইতিহাসে † আছে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক কালের কাস্টম হাউস থেকে জেনারেল পোস্ট অফিসের জমিটা জুড়ে যখন ইংরেজরা তাদের কেল্লা তৈরি করেছিল, যখন এই ফোর্টকে কেন্দ্র করেই কয়লাঘাট থেকে ফেয়ারলি প্লেসের এলাকাটায় একটু একটু করে গড়ে উঠছিল 'হোয়াইট টাউন' তখন রেডিও'র বাড়ির জমিতে ছিল কোম্পানির একটা গুদামঘর, বারুদখানা আর একটা গোরস্থান। তার চারদিকে ছিল বনবাদাড়, তার ভেতরে ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল ছেচা-বাঁশের বেড়া আর মাটি দিয়ে লেপা গুটি কয়েক ঘর। এখানে খানা, ওখানে খন্দ আর পচা জলের ডোবা। যেমন মশা তেমনি মাছি, তেমনি ছিল ম্যালেরিয়ার বহর। ১৭০৫ থেকে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১২০০ ইংরেজ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল, তার ভেতরে যে ৪৬০ জন মারা গিয়েছিল তাদের প্রত্যেককেই কবর দেওয়া হয়েছিল এই সমাধি-ভূমিতে। তখনকার ইংরেজ ডাক্তার ওয়ারেন রিপোর্ট দিলেন—Sick and dying super-abundant—এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই রেডিও'র এই বাড়ির প্লটের পাশে গড়ে উঠল ইংরেজদের প্রথম হাসপাতাল। ১৭৫৮ সালে শীতকালে কয়েকদিন ধরে মুষলধারে এমন বৃষ্টি হলো যে, সেই তোড়ে বৃষ্টি আর কুয়াশায় গঙ্গায় জাহাজডুবি হয়ে ৩০০ ইংরেজ নাবিক প্রাণ হারালো।* তাদের ভেতরে যাদের শবদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল তারাও চিরকালের মত ঘুমিয়ে আছে এই গোরস্থানেই। ১৭৬২ সালে

† C R. Wilson's Early Annals of Bengal, as quoted in 'A short History of Calcutta' by A. K. Roy in Census of India, 1901. Vol. VII, pt. I. P. 68.

*Calcutta In Olden Times, Calcutta Review, Vol. 35, Page 70.

ইংরেজদের এই নয়া উপনিবেশে নেমে এল আর এক বিপর্যয়। এল মহামারী। মরল পঞ্চাশ হাজার ব্ল্যাক পীপল্। আর সে সময়ে ডাঁকসাইটে দুই ইংরেজ চিকিৎসক ডক্টর হলওয়েল এবং ডক্টর ফুলারটনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মারা গেল ৮০০ সাদা চামড়ার মানুষ,† তাদের কারো কারো শবদেহও এই কবরভুমির মাটিতেই মিশে রইল। তারপর ?

তারপর কলকাতার সেই আদিযুগের ইংরেজদের গোরস্থানের জমিটার কি রদবদল হয়েছিল তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে ইতিহাসে *—"প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টানদের এই প্রধান গির্জাটি (সেণ্ট জন চার্চ—গারস্টিন প্লেসের রেডিও'র বাড়ির সংলগ্ন) পুরাতন বারুদখানা ও পুরাতন গোরস্থানের জমির ওপর নির্মিত হইয়া ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন রেভারেণ্ড মি. জনসনের দ্বারা উৎসৃষ্ট এবং লর্ড কর্নওয়ালিশের দ্বারা উদ্বোধিত হয়"...এই গির্জাসংলগ্ন গোরস্থানেই কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক, ডাক্তার হ্যামিল্টন (যিনি বাদশাহ ফাররুকশিয়ারকে আরোগ্য করে পুরস্কারস্বরূপ বিনাশুল্কে বাণিজ্য এবং কেল্লার আশপাশে চল্লিশ বিঘা নিষ্কর জমি কোম্পানিকে পাইয়ে দিয়েছিলেন), ক্লাইভের সহযোগী নৌসেনাপতি অ্যাডমিরাল ওয়াটসন, রোহিলাযুদ্ধে নিহত ইংরেজ সৈনিকরা এবং কে জানে হয়তো পরবর্তীকালে আকাশবাণীর কলকাতার জনক ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানির সেই দুঃসাহসী অগ্রগামীরাও যারা হেস্টিংস স্ট্রীটে প্রথম ব্রডকাস্টিং ট্র্যান্সমিটার বসিয়েছিল তাদের কারো কারো সমাধিও আছে এই কবরভুমিতে। আর এই দুইশত বছরের প্রাচীন সমাধিভুমির বিভিন্ন কবরের স্মৃতিফলকের লেখাগুলো পড়লেও বেশ বুঝতে পারা যায় দূর বিদেশের মাটিতে যারা ঘুমিয়ে রইল তাদের সঙ্গে তাদের হাজারো আশা-আকাঙ্ক্ষারও সমাধি হয়েছে। সেইজন্যেই কি—

একদিন এক মেঘলা দিনে যখন টিপ-টিপ বৃষ্টি ঝরছিল, যখন বিকেল হতে না হতেই সন্ধ্যার ধূপছায়া অন্ধকার নেমে এসেছিল—সেই সময়

†Long's Selection From Unpublished Records of Government's Proceedings of Court. 1764.

*প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়, হরিহর শেঠ, পৃঃ ২২০।

রেডিও'র জনৈক কর্মী রেডিও-সেটে পিন দিয়ে খুঁচিয়ে আর হেডফোন কানে লাগিয়ে কোন বিখ্যাত শিল্পীর গান শুনছিল।*

গান শেষ হলো। বাইরে মেঘ থমথম আর বৃষ্টিঝরা আকাশের দিকে সে চোখদুটো ছড়িয়ে দিতেই দেখল—সেণ্ট জন গীর্জার কবরখানার উঁচু পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে এক সাহেব তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে! কর্মচারীটির মনে হলো—সেই মেঘ বৃষ্টি আর ছায়া ছায়া অন্ধকার দিয়েই গড়া সেই অস্পষ্ট দীর্ঘ ছায়ামূর্তি যেন কোন সুদূর রহস্যময় জগৎ থেকে তাকে আহ্বান করছে। এখানকার মাটিতে হতভাগ্য যে হাজার হাজার ইংরেজ তাদের অজস্র অতৃপ্ত কামনা-বাসনা নিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে শত শত বছরের ওপার থেকে তাদেরই লোকান্ত-পারের অশরীরী প্রেতচ্ছায়া যে রেডিও'র পুরানো বাড়ির নির্জন করিডরে, শূন্য অফিস-ঘরে, স্টুডিওতে ঘোরাফেরা করে না—একথা কে বলবে!

৭

> রাইটার্সের নাইট গার্ডরা বলে, পাঁচ নম্বর ব্লক জায়গা ভালো নয়—বারান্দা দিয়ে কারা যেন হেঁটে বেড়ায়। ঘরের ভেতর টাইপের শব্দ শোনা যায়।

—ছোটোখাটো ব্যাপার নয় মশাই। বি. বা. দী. বাগের চারখানা গ্যারেজ নিয়ে ছয় লক্ষ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসের এই রাইটার্স বিল্ডিং, হাসতে

*রেডিও'র আদিযুগের এই সেটটিকে বলতো—ক্রিস্ট্যাল-সেট। একটা ছোট কাঠের বাক্সের ভেতরে কিছু ইলেকট্রনিক পার্টিকলস্ এবং জটিল যন্ত্রপাতি থাকতো। তার ওপরে থাকতো এরিয়েল। পিন্ দিয়ে খুঁচিয়ে দিলে মৃদু আওয়াজ শোনা যেত। কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনতে হতো। একসঙ্গে দু'তিনজনের বেশি শুনতে পেত না। রেঞ্জ ছিল মাত্র ত্রিশ মাইল। ইণ্ডিয়ান রেডিও কোম্পানি নামে বৌবাজারের একটি ফার্ম এই সেট বাড়ি বাড়ি ঘুরে ক্যানভাস করে বিক্রি করতো। এই ক্রিস্ট্যাল-সেটের দাম ছিল ৮ টাকা। ৬ টাকা পেত ইণ্ডিয়ান রেডিও কোম্পানি, আর ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশান পেত ২ টাকা।

হাসতে বললেন মহাকরণের কেয়ার-টেকার ফণীন্দ্রমোহন রায়। একটু থেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে ম্যাপের মত বিরাট একটা নকশা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

—বুঝতে পারছেন কিছু?

আমি মাথা ঝাঁকালাম। আস্তে আস্তে বললাম, জটিল গোলকধাঁধার মত এই প্ল্যানের ব্লুপ্রিন্ট কি করে বুঝবো!

—এটা হলো রাইটার্স বিল্ডিং-এর লেটেস্ট নকশা। এই দেখুন. মহাকরণের ক্যাম্পাসের ভেতরে মোট তেরটা বাড়ি।

—তেরটা!

—বিশ্বাস হচ্ছে না তো? খুক খুক করে হাসলেন কেয়ার-টেকার। দু'চোখে গর্বের আভাস ফুটে উঠল।

বহুদর্শী, অভিজ্ঞ শিক্ষকের মতই সেদিন আমাকে রাইটার্সের যেসব তথ্য জানিয়েছিলেন তিনি তা সংক্ষেপে এখানে বলা হলো—

সবচেয়ে পুরানো এই মেন বিল্ডিং—চারতলা। তার সংগে ছয়তলা বাড়ি আছে তিনটি। আর চারতলা বাড়ি আছে নয়টি—এই হলো মোট তেরটি। তাছাড়াও আছে একতলা একটা বিশাল বাড়ি, তাতে আছে ক্যাণ্টিন-ঘর, হল-ঘর ইত্যাদি নানা রকমের ঘর। এই বিশাল রাইটার্সে শুধু ঘরই আছে চোদ্দশ চব্বিশ। হল-ঘর তেতাল্লিশটা। বাথরুম একশো ষাট। সিঁড়ি পঁচিশ। লিফট ছয়। সেণ্ট্রাল গেটের ধারে বাগান আছে একটা। ছাদের ওপরে ফুলের পট আছে দু'হাজারেরও বেশি। কী নেই রাইটার্সে?

হিন্দুদের শিবমন্দির, মুসলমানদের প্রার্থনা-ঘর, জেল-ডিপো, সুরভি কাউণ্টার, ছ-ছয়টা ক্যাণ্টিন, গোটা চল্লিশেক পানবিড়ির দোকান, গোটা পঞ্চাশেক চায়ের ও মিষ্টির দোকান, ছোটখাটো একটা দমকল, ব্যাংক মায় ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশান অফিস পর্যন্ত আছে এখানে।

এই পর্যন্ত বলে থামলেন ফণীবাবু। দূরে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই সুপ্রাচীনকালের বাড়ির অতিকায় এক-একটা প্রেতচ্ছায়ার মত পিলারগুলোর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, —জানেন, মন্ত্রী থেকে ঝাড়ুদার পর্যন্ত সব মিলিয়ে মোট ছয়হাজার লোক কাজ করে এখানে। ভিজিটার আসে নানা কাজে, তা ধরুন—প্রায়

ছয় হাজার। দিনের বেলাটা এই বারো হাজার লোকের গুঞ্জনে সারাটা রাইটার্স গমগম করে। কিন্তু—

হঠাৎ থেমে গেলেন ফণীবাবু। চোখেমুখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। ভেতরে ভেতরে যেন কোন যন্ত্রণা চেপে অস্ফুটস্বরে বললেন, কিন্তু রাত হলো কি গোটা বাড়িটা শ্মশানের মত একেবারে নিঝুম। আর —বলেই ব্যস্ত হয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

—রাত্রিতে আপনার নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স কি ফণীবাবু, অনুনয় করে বললাম। সেসব শুনতেই তো—

—আরে—না-না, থাক সেসব কথা, হেসে হেসে ঘরের অস্বস্তিকর পরিবেশটাকে হাল্কা করে বললেন ফণীবাবু। স্যার, আপনারা বুদ্ধিজীবী —ইনটেলেকচুয়াল—আপনারা ওসব শুনলে বিশ্বাস করবেন না, গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দেবেন।

ঢং-ঢং-ঢং। তাঁর অফিস-ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে সাতটা বাজল। রাইটার্সের চারতলায় তাঁর কোয়ার্টারের পাশে কাঠের সিঁড়িতে কাদের যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল।

—এত রাত্রে রাইটার্সে কারা আসছে ?

—একটু ধৈর্য ধরুন, এখুনি সব বুঝতে পারবেন,—ফণীবাবু বলতে বলতেই দারোয়ানরা লাইন করে এসে এক-একটি করে চাবি তাঁর টেবিলে জমা দিতে লাগল। আর মহাকরণের বিশাল সংসারের মালিক ক্ষিপ্রগতিতে তাঁর অফিস-ঘরের পূবের দেওয়াল-জুড়ে টাঙানো কাঁচের পাল্লা-দেওয়া চাবির বাক্সটা খুলে ফেললেন। তার ভেতরে বসানো রয়েছে অগুনতি হুক। হুকের ওপরে ওপরে নম্বর লেখা রয়েছে। ফণীবাবু চোখদুটো কুঞ্চিত করে চাবির নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে বাক্সে রাখতে রাখতে বললেন, জানেন, প্রত্যেকদিনই আমাকে এই ছয় হাজার চাবি সামলাতে হয়—হঠাৎ আমার খুব কাছে এসে গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, আর এই যে চাবি দিচ্ছে— এরা কারা জানেন ?

—কেন, দারোয়ান !

ফণীবাবু মাথা ঝাঁকালেন। কেন যেন অর্থপূর্ণ একটা হাসি হেসে বললেন, আপনি যে জন্য এসেছেন তার সুরাহা করে দিতে পারে এরা— এরাই আপনার র-মেটিরিয়েলস।

—মানে ? আমি তো কিছুই—

—এরা হলো প্রোটেকটেড এরিয়ার অর্থাৎ মন্ত্রীদের এলাকার নাইট-গার্ড, একটু থেমে দূরের অন্ধকার করিডরের দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে বললেন, এদেরই এক-একজনের যা থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স তা শুনলে—

—কিন্তু ফণীবাবু, আমি যে আপনারই নাইট-রাউণ্ডের অভিজ্ঞতা শুনবো বলে এসেছি !

আমার কথা যেন শুনতে পেলেন না তিনি। তাঁর টেবিলের ওপরের চাবিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন—এই যে দেখছেন চাবি জমা পড়ছে—(বাক্সের ফাঁকা ফাঁকা হুকগুলোর দিকে লক্ষ্য করে) কিন্তু জানবেন কোন কোন মন্ত্রীর ঘরের চাবি আসতে এখনো দেরি আছে। প্রায়ই চীফ মিনিস্টার সকলের শেষে যান। তাঁর যেতে যেতে প্রায় দশটা বাজে। উনি চলে গেলেই আমাকে রাউণ্ডে বেরুতে হয়—বিশেষ করে প্রোটেকটেড এরিয়ায়। হঠাৎ চুপ করে গিয়ে কেন যেন রাইটার্সের নকশাটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। দু'চোখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল।

—আপনি কি একাই যান ?

—একা বৈকি ! নাইট-গার্ড এবং সান্ত্রীরা তো যার যার পোস্টিং-এ থাকে। হাতে আট ব্যাটারির টর্চ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে যখন দোতলায় যাই তখন গা-টা কেমন যেন ছমছম করে। আমার মনে হয়—মনে হয় আমি যেন গভীর জংগলের ভেতরে কোন পোড়ো বাড়িতে এসে পড়েছি—চুপ করে গেলেন ফণীবাবু। আর কেমন স্থির আর অপলক চোখে তাঁর অফিস-ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নাইট-রাউণ্ডের সেই দুঃসহ ছবিগুলো যেন শোভাযাত্রা করে চলেছে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে।

সেদিন শহর কলকাতার সবচেয়ে পুরানো এবং বড়ো অফিস-বাড়ির কেয়ার-টেকার প্রত্যক্ষদর্শী ফণীন্দ্রনাথ রায় তাঁর তীব্র আবেগ ও ব্যথা-বেদনা মিশিয়ে যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছিলেন তা এখানে সংক্ষেপে বলা হলো—

রাইটার্সের দোতলার পাঁচনম্বর ব্লকটা জায়গা ভালো নয়। নাইট-

গার্ডরা একা একা ওদিকে যেতে ভয় পায়। পুলিসরাও খুব সহজে পাঁচনম্বরের দিকে যেতে চায় না।

সেণ্ট্রাল ব্লকের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় এলেই বুকের ভেতরটা ঢিব্ ঢিব্ করবে। আর পাঁচনম্বরের দিকে যত এগোনো যাবে তত কানে আসবে নানারকমের রহস্যময় শব্দ। হাওয়া নেই। বাতাস নেই। গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। অথচ দরজা জানালার কাঁচের শার্শিগুলো থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল। বেশীর ভাগ ঘরই সেই বিকেল পাঁচটায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ ভেতরে খট্-খট্-খট্ আওয়াজ হচ্ছে। ঘরের ভেতরে বসে কে যেন ঝড়ের বেগে টাইপ-রাইটার চালাচ্ছে! আর—

আর মনে হবে কাছে দূরে কাদের যেন বুট জুতো-পরা জোড়া জোড়া পায়ের আওয়াজ হচ্ছে, কারা যেন একসঙ্গে মার্চ করে পাঁচনম্বরের দিকে এগিয়ে আসছে। আবার মাথা-পাগলা হাওয়ার ঝড়ের মত হঠাৎ ভেসে আসে দূর থেকে অব্যক্ত যন্ত্রণার গোঙানির শব্দ। মনে হয় ওই দোতলার করিডরের ঘন থকথকে অন্ধকারের ভেতরে কারা যেন জবুথবু হয়ে বসে তীব্র আর মর্মান্তিক কোন দুঃখে আর্তনাদ করছে।

ভয়? নিশ্চয়ই। পঁচিশ বছর আগে অদ্ভুত এই চাকরিতে এসে ফণীবাবুরও ভয় লাগতো বৈকি। কিন্তু জীবিকার দায় বড় দায়। আস্তে আস্তে তার গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। রাইটার্সের অশরীরীরা যেন তাঁর অবস্থাটা বুঝেই তাঁকে মেনে নিয়েছে—এপর্যন্ত বলে হাসতে শুরু করলেন ফণীবাবু। হাসির রেশ টেনেই আবার বললেন, তবে হ্যাঁ— চাকরির গোড়ার দিকে একদিন রাত্রে এমন একটা মারাত্মক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল যে আমি ভয়ে আতংক একেবারে—

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—টেলিফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো—নমস্কার স্যার—নমস্কার—কী!—চীফ মিনিস্টার আজই রাত এগারোটায় দিল্লী থেকে ফিরছেন?—হ্যালো—কী! দমদম থেকে সোজা রাইটার্সে আসছেন—তখুনি ক্যাবিনেট মিটিং বসবে। রিসিভার ছেড়ে দিয়েই আমাকে বললেন, শুনলেন তো? I am sorry, sir—আর এক মুহূর্ত সময় দিতে পারবো না। খুব ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন ফণীবাবু। বললেন, এখুনি আমাকে ক্যাবিনেট-রুম, চীফ মিনিস্টারের চেম্বার, অন্যান্য মন্ত্রী, সেক্রেটারি আর অফিসারদের ঘর খুলতে হবে। চাল্দ

করতে হবে এয়ার-কণ্ডিশান। আর বলেন কেন মশাই—এই হলো আমার চাকরি !

আমি কোন কথা বললাম না। আমার অসহায় এবং বিপন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে ফণীবাবু বললেন, প্লীজ, আবার একদিন আসবেন—সব সব বলবো - নাইট-গার্ডদের সঙ্গে ইণ্টারভিউ করিয়ে দেব।

রাইটার্সের চারতলা থেকে নেমে এলাম।

থমথম করছে দিনের আলোয় সেই লোক-গমগম বি. বা. দী বাগ। জমাট অন্ধকার গায়ে মেখে বড় বড় বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে এক-একটি অতিকায় প্রেতের মতই। সাঁ সাঁ বাতাসের আর্তনাদ আছড়ে পড়ছে লাল দিঘির পাড়ে কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে।

চার্চ থেকে শুরু করে রিজার্ভ ব্যাংকের বাড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ রাইটার্সের বিশাল দালানটা অন্ধকারে একটা উঁচু পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেলভেডিয়ার, হেস্টিংস হাউস আর গারস্টিন প্লেসের বাড়ির মতই রাইটার্সও গোস্ট-হণ্টেড !—কিন্তু কেন ? কোন অতৃপ্ত বিদেহী প্রেতসত্তারা এখানে আনাগোনা করে ? আজ যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাকরণ সেখানে সুদীর্ঘ তিনশ বছর আগে (শহর কলকাতার পত্তন) সেখানে কি ছিল আর সেইখানেই কি কোন খুন, জখম বা কোন অপঘাত মৃত্যু হয়েছিল—এসব প্রশ্ন ভীড় করে এল মনে।

গভর্নমেণ্ট রেকর্ডস থেকে জানা যায়, আজ থেকে প্রায় দুইশো বছর (১৭৭৬) আগে তৈরী হয়েছিল আধুনিক কালের এই রাইটার্স বিল্ডিং। কিন্তু আদিকালের সেই ট্যাংক স্কোয়ারের (লালদিঘি) উত্তর পাড়ে রাইটার্সের জমিটুকুর বিচিত্র ইতিহাস আছে। আর তার ভেতরেই আছে এই বাড়ি প্রেত-অধ্যুষিত হওয়ার কিছু আভাস।

১৭৫৮ সালের কলকাতার নকশায় দেখা যাচ্ছে, এখনকার কাস্টম হাউস এবং জেনারেল পোস্ট অফিসের জমিতে ইট আর চুন বালি অর্থাৎ Brick and mortar দিয়ে তৈরি প্রথম ফোর্ট উইলিয়মকে কেন্দ্র করে আদিকালের ইংরেজরা এই অঞ্চলে গড়ে তুলেছিল এক-একটা সুদৃশ্য ইমারত। প্রাসাদ-নগরীর জন্ম হয়েছিল এই কেল্লা থেকে। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার প্রথম পাকা বাড়ি এই ফোর্ট তৈরী হওয়ার পর

থেকেই বিলেত থেকে কোম্পানির চাকরি নিয়ে অফিসার এবং কেরানীরা (রাইটার) আসতে শুরু করলো। এরা থাকবে কোথায় ? গভর্নমেণ্ট ডকুমেণ্টসে আছে *—in order to keep them under some discipline and control they were accommodated in the ground floor of the fort.

ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে থাকতে থাকতে তাদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। যারা মারা গিয়েছিল তাদের কবর দেওয়া হয়েছিল রাইটার্সের জমিতে। সেই পড়ো জমিটাতে তখন ভাঙ আর কলাগাছের জঙ্গল।

রাইটারদের আর ফোর্টের একতলায় রাখা সম্ভব হলো না। হলওয়েল-বারওয়েল প্রমুখ ইংরেজ কর্তাদের নজর পড়ল ট্যাংক স্কোয়ারের উত্তরে ওই পতিত ভিটেটার ওপর। ১৭০৯ সালে এইখানেই সারি সারি খড় দিয়ে ছাওয়া মাটির কোঠাবাড়ি তৈরি হলো চারটি—These four houses made of thatch and mud were appropriated for the use of junior servants of the company and the writers in the fort. **

সাতাষট্টি বছর পরে (১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) বারওয়েল সাহেবের নির্দেশে টমাস লায়নের তত্ত্বাবধানে (রাইটার্সে পিছনে লায়নস রেঞ্জ যাঁর স্মৃতি বহন করছে) সেই চারটি মাটির বাড়ি ভেঙে রাইটারদের জন্য তৈরী হলো ছোট ছোট উনিশটি 'অ্যাপার্টমেণ্ট' অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র এক-একটি পাকা বাড়ি। এইখানে—এই বাড়িগুলোতেই ছিল রাইটারদের রেসিডেন্স এবং অফিস।

বিলেত থেকে সদ্য-আসা ছোকরা রাইটাররা এইখানেই উদ্দাম আর উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করতো। লর্ড ভ্যালেণ্টিন (১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন—

প্রত্যেক রাইটারের দুই ঘোড়ায় টানা এক-একটা খোলা গাড়ি ছিল।

* Short History of Calcutta, by A. K. Ray—In census of India. Vol 1, pt. 7.

** Short Hislory of Calcutta, by A. K. Ray—In census of India, pt. 1 to 17.

চৌরঙ্গীর ফাঁকা মাঠে সেই গাড়ির দৌড়ের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত খুনো-খুনিতে পর্যবসিত হতো। যখন-তখন নিতান্ত তুচ্ছ কারণে 'ডুয়েল' লড়ে কেউ জখম হতো কেউ খুনও হয়ে যেত। প্রতিটি সন্ধ্যায় স্ফূর্তিবাজ আর বেপরোয়া রাইটারদের ডাইনিং-টেবিলে দামী শ্যাম্পেনের স্রোত বয়ে যেত। আর রাত্রি যত গভীর হতো ততই তাদের বেসুরো গলার কোরাস গানের তীব্র শব্দে চারিদিকের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়তো।*

১৮৭৭ থেকে ১৮৮২ সালের ভেতরে অ্যাশলে ইডেনের (Ashley Eden) আমলে সেই উনিশটি বাড়ি ভেঙে তৈরী হয়েছিল বেঙ্গল গভর্ন-মেণ্টের সেক্রেটারিয়েটের স্থায়ী দপ্তর, পাঁচ-পাঁচটা ব্লক নিয়ে আধুনিক কালের এই বিশাল বাইটার্স বিল্ডিং।

আজও—আজও এই ঐতিহাসিক বাড়ির দেওয়ালে কান পাতলে শোনা যাবে—শতাব্দীপূর্বের সেই হাস্যোচ্ছল উচ্ছৃংখল রাইটারদের বিপুল অট্টহাসি ও আনন্দ-সংগীতের অনুরণনা।

আর সেই জন্যেই মুনশিরাম যখন বলল—স্যার, গহরা রাতমে এ বাড়িতে হামি ইংরেজী গানা নিজো কানোমে শুনা থা, তখন মোটেই বিস্মিত হই নি।

মুনশিরাম। রাইটার্সের নাইট-গার্ড। ১৯৪৪ সালে বিশবছর বয়সে চাকরিতে এসেছিল। রাজ্য ও রাজনীতির বহু ভাঙা-গড়ার প্রত্যক্ষদর্শী সে। ফণীবাবু পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার উদ্দেশ্যটা বলতেই তার এবড়ো-খেবড়ো মুখে কেমন একটা আতংকের ছায়া নেমে এল। কপালে হাত দু'টো ঠেকিয়ে কে জানে হয়তো এ-বাড়ির বিদেহী প্রেতসত্তাদের উদ্দেশ্যেই প্রণাম জানিয়ে বলল, হুজুর হামার গোস্তাকি মাফ করিয়ে নেবেন—এই সামকো হামি তেনাদের কথা বলতে পারবো না।

আমার অনেক অনুরোধ এবং শেষ পর্যন্ত তার ওপরওয়ালার নির্দেশে মুনশিরাম বলেছিল তার অভিজ্ঞতার কথা। সে-বিবরণ যেমন বিচিত্র তেমনি রোমাঞ্চকর।

সেদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল। সেই সঙ্গে ছিল ঝড়ো

* **Calcutta Past and Present, BLECHYDEM**

হাওয়া। মনুশিরামের মনে হলো, সারা পৃথিবী জুড়ে যেন মহাপ্রলয় শুরু হয়েছে। এমনিই রাত্রে এই জিন-পরীকা কোঠিতে গার্ড দিতে গা-টা কেমন ছমছম করে। আর এই সব ঝড়-বাদলার রাতে তো কথাই নেই। নিদারুণ একটা ভয় বুকের ভেতরে ধুকপুক করে। কিন্তু উপায় কি ?

চাকরি। টর্চ জ্বালিয়ে বুটজুতোয় খট্‌খট্‌ শব্দ তুলে মনুশিরাম এল এক নম্বর ব্লকের দোতলায়। থেকে থেকে গুম গুম করে ডাকছে মেঘ। আকাশের বুক চিরে উগ্র আলোর ঝিলিকে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

দোতলার বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলেছে মনুশিরাম। বাতাসের দাপটে জানালা-দরজার খড়খড়িগুলো থরথর করে কাঁপছে। কোথাও কোন খোলা দরজার পাল্লা দু'টো ঠকাস ঠকাস আওয়াজ করছে। এই রকমই শব্দ করে কে যেন হাতুড়ি পিটছে মনুশিরামের বুকের ভেতরেও। আজ কেন যেন বড় বেশি ভয় করছে। যেই সেণ্ট্রাল ডেসপ্যাচ অফিসের সামনে এল অমনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। সে স্পষ্ট শুনতে পেল, সি ডি. ও.'র (সেণ্ট্রাল ডেসপ্যাচ অফিস) ঘরটার ভেতর থেকে ভেসে আসছে একটা বুকচাপা গোঙানির আওয়াজ। দারুণ যন্ত্রণায় কে যেন আর্তনাদ করছে!

—কে—কে ওখানে ? চিৎকার করে বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। কে যেন সজোরে তার গলা চেপে ধরেছে। আর ঠিক তখুনি—

তখুনি ঘটে গেল কাণ্ডটা।

দুম-দুম করে অনেকগুলো জোড়া পায়ের আওয়াজ হলো সেণ্ট্রাল স্টেয়ার-কেসে। ভয়ে আতঙ্কে আধমরা হয়ে কোন রকমে যেই টর্চ জ্বালল মনুশিরাম অমনি দেখল, টর্চের সাদা আলোর গোলাকার বৃত্তের মাঝখানে কোট-প্যাণ্টুলন-টাই পরা এক সাহেব। বুকের বাঁদিকটা চেপে ধরে যেন কোন কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে ঝুঁকে পড়ে মাঝখানের সেই সিঁড়ি বেয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই জখমী সাহেবের ছায়াদেহের প্রায় সংগে সংগেই তাকে অনুসরণ করে আরও কয়েকটি ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে যেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে লাগল তখন মনুশিরাম আর পারল না। শুধু এইটুকু মনে আছে, একনম্বর ব্লকের সান্ত্রীকে চিৎকার করে ডেকেছিল। তারপরে আর সে কিছু বলতে পারে না।

—তুমি যে ইংরেজী গানের কথা বললে মুনুশিরাম!

কোন কথা বলল না মুনুশিরাম। কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত দূরে অন্ধকার বারান্দাটার দিকে তাকিয়ে রইল। আমার মনে হলো—সেই দুর্যোগের রাতের দুঃসহ স্মৃতি যেন এখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার চেতনা।

বেশ কিছুক্ষণ পর খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে সে বলল, হুজুর সারি দু'তলাটা হলো উ লোগোঁকা আস্তানা।

—কি রকম?

বহুদর্শী মুনুশিরাম হিন্দী বাংলা মিশিয়ে যে বিবরণ বলেছিল তার সারাংশ এখানে বলা হলো—

সেদিন তার ডিউটি ছিল দোতলার তিন নম্বর ব্লকের প্রোটেকটেড এরিয়ায়। রাউণ্ড দিতে দিতে হঠাৎ তার কানে এল ইংরেজী গানের সুর। শব্দটা আসছে দীর্ঘ সেই বারান্দার একেবারে পশ্চিম দিক থেকে। সেদিকটা ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে সেদিকে গিয়ে দেখল, এক মন্ত্রীর ঘরে নিওনের জোরালো আলো জ্বলছে।

কী ব্যাপার—কোন এমারজেন্সী মিটিং বসে গিয়েছে না কি! আর তারা কেউ-ই জানতে পারল না!

দরজার কাঁচের শার্শি দিয়ে তাকিয়ে দেখল, আলোকোজ্জ্বল সেই ঘরে বেহেড মাতাল একদল সাহেব নেশার ঘোরে ধেই ধেই করে নাচছে। কেউ কেউ আবার টাল সামলাতে না পেরে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। আর জন কয়েক হেঁড়ে গলায় গান জুড়ে দিয়েছে!

—পুলিস—পুলিস—নিদারুণ ভয়ে সে আর্তনাদ করে উঠল। ছুটে এল পুলিস, এল হেড নাইট-গার্ড। তারা এসে দেখল কোথাও কিছু নেই, নিশি রাত্রে মন্ত্রীর সেই ঘরের ভেতরটা যেমন জমাট অন্ধকার থাকে তেমনিই রয়েছে।

মুনুশিরাম থেমে গেল। কেয়ার-টেকারের অফিস-ঘরটায় অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা থমথম করতে লাগল। ফণীবাবু দূরে অন্ধকার টেলিফোন-ভবনের দিকে তাকিয়ে কেমন ছাড়া ছাড়া উদাস গলায় বললেন, ওদের স্টেটমেণ্টে কিছু 'কালারিং' থাকতে পারে—কিন্তু রাত্রে এ-বাড়িতে এমন

অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যার কোন 'এক্সপ্লানেশান' আমি আজও খুঁজে পাই নি।

আমি কোন কথা বললাম না। কী-ই বা বলার থাকতে পারে? ফণীবাবু জানেন না, পৃথিবীর কোন দেশেরই 'গোস্ট-হণ্টেড হাউসে'র নানা অলৌকিক কাণ্ড-কারখানার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। কেন গভীর রাত্রে বাকিংহাম প্যালেসের করোনেশান হলের তরল অন্ধকারের বুক চিরে একটা তীক্ষ্ণ নীলচে আলোর রেখা আছড়ে পড়ে আর ঠিক ছায়াবাজির মতই দূরের কালো থকথকে অন্ধকার থেকে বর্ণাঢ্য পোশাকে সজ্জিত অতীত রাজপুরুষরা এক এক করে সারি সারি বেরিয়ে এসে সেই নীল আলোর গোলক পেরিয়ে আবার কালি-ঢালা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়? কেন-ই বা আজও ভরদুপুরে ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসের বাগানের শাঁ শাঁ বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে আসে দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি—ডিং—ডং—ডিং—ডং?

—প্রেসিডেণ্ট আসছেন—এই প্রেসিডেণ্ট আসছেন—চাপরাশি-বাটলার-দারোয়ানদের ভেতরে চাপা ফিসফিসানির ঝড় ওঠে। আর তারপরেই দুপুরের খর রোদের ভেতরে ঝাপসা, ঘসা ঘসা ছবির মত ফুটে ওঠে দুই ঘোড়ায় টানা খোলা একটি গাড়ির ছবি। গাড়ির আরোহীর ছায়ামূর্তির ভেতরে অ্যাব্রাহাম লিংকনের চেহারার আভাস পাওয়া যায়। নানাবর্ণের ফুলের সমারোহে ভরা সেই বিশাল উদ্যানের ভেতরে গাড়ি চলার চক্রাকার পথটি পরিক্রমা করে এক্‌জিট গেটের দিকে যেতে না যেতেই যেন আকাশের আলোয়, হলুদ রোদে শিশির বিন্দুর মতই মিলিয়ে যায় সেই গাড়ি।

—এত কী ভাবছেন মশাই, ফণীবাবুর কথায় ধাক্কা খেয়ে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। ওই দেখুন আমার নন্দী-ভৃঙ্গীরা সব গুটি গুটি এসে দাঁড়িয়েছে তাদের এক্সপিরিয়েন্স বলবে বলে।

—আদাব হুজুর, আদাব—এক বৃদ্ধ মুসলমান সামনে এগিয়ে এল। পরনে চেক লুঙ্গি, গায়ে মিলিটারি খাকি শার্ট।

—এর নাম জমিরুদ্দিন, ফণীবাবু বললেন। রাইটার্সের হেডজমাদার।

রাইটার্সের মন্ত্রী, সেক্রেটারি এবং অফিসারদের কার চেম্বারে কবে কার্পেট বিছানো হয়েছিল—কি ধরনের কার্পেট, এসব ওর নখদর্পণে।

—ডক্টর রায়—মানে বিধান রায়ের আমলের ঘটনা স্যার,—জমিরুদ্দিন বলতে শুরু করল। একদিন সন্ধ্যায় আমার ডাক পড়ল। সি. এম. (চীফ মিনিস্টার)-এর ঘরে নতুন গালিচা পেতে দিতে হবে। রাত আটটার সময় নাকি তাঁর ঘরে এমারজেন্সী মিটিং বসবে।, আমি আমার চ্যালাচামুণ্ডাদের নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। আমার কাজ শেষ হতে হতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। ফণীবাবুর দিকে ইঙ্গিত করে বলল—সাহেব বললেন, সি. এম. না আসা পর্যন্ত একটু থেকে যাও। কখন কি দরকার হবে বলা যায় না।

দোতলার দক্ষিণমুখো খোলা বারান্দায় একটা টুলের ওপরে বসে আছি। কিন্তু—আশ্চর্য—আটটা বেজে গেল। সি. এম এলেন না—আর কোন মন্ত্রীও এলেন না! অফিসাররা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেলেন। কিন্তু হুকুম না পেলে আমি তো যেতে পারি না—এই পর্যন্ত বলে থামল জমিরুদ্দিন। কেন যেন অন্যমনস্ক হয়ে কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল। আর কোঁচকানো চোখের দৃষ্টিটা কেমন সুদূর হয়ে উঠল।

—তারপরে কি হলো জমিরুদ্দিন ?

—বলছি হুজুর—সব বলছি—কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল সে। তারপরে আবার বলতে শুরু করল, দোতলার তিন নম্বর ব্লকের সিঁড়ির মুখে একটা কমজোরী আলো জ্বলছিল। সেই মরা আলো বারান্দার দুদিকের অন্ধকারকে যেন আরও ঘন করে তুলেছিল।

আমি টুলের ওপরে বসে ঘুমের ভারে ঢুলে ঢুলে পড়ে যাচ্ছি। লালদিঘির ওপর দিয়ে বয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় স্যার, কখন যে ভিজিটারদের বেঞ্চের ওপরে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা বলতে পারবো না।

—খট্-খট্-খট্—খুব জোর আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা আসছে ওই সেই একেবারে শেষে পাঁচনম্বর ব্লকের দিক থেকে। এখানকার সব কর্মচারীদের ভাষায়—পাঁচনম্বর ব্লক হলো 'খারাপ জায়গা'! এই কথাটা শুনলেই আমার হাসি পায়। বর্ধমান জেলার গঙ্গাটিকুরি গ্রামে আমার বাড়ি স্যার—ছোটবেলা থেকে আর যাই থাক—ভূতপ্রেতের ভয়

আমার কোনকালেই নেই। সারারাত একলা গোরস্থানে বসে কবর পাহারা দিয়েছি।

—কেন ?

—আর বলেন কেন হুজুর, যুদ্ধের সময় কাপড় কণ্ট্রোল হয়েছিল না ? সে সময় মুর্দা (শবদেহ)'কে গোসল করিয়ে যে নতুন কাপড়ে 'কাফন' করা হতো সেই কাপড় চুরি করতে আসতো। মুর্দাকে বেপর্দা করলে আর সে বেহস্তে যেতে পারে না—থাক সে সব কথা। কবর গার্ড করে থাকতে থাকতে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছি নিশ্চিন্তে। জিন-পরীর কথা একবারও মনে হয় নি।

—জমির সংক্ষেপে বলো, ফণীবাবু সতর্ক করে দিলেন।

—আচ্ছা স্যার, আচ্ছা। বয়স হয়েছে তো, তাই কথাবার্তা কেমন—জমিরুদ্দিন মাফ চেয়ে নিয়ে বেশ সংযত হয়ে আবার বলতে শুরু করল—

সেই খট্-খট্ শব্দ লক্ষ্য করে কোন কিছু না ভেবেই ছুটলাম। যেই চার নম্বর ব্লকের কাছাকাছি গিয়েছি, হঠাৎ দেখি অফিসারদের ল্যাভেটারিতে আলো জ্বলছে। আর তার সামনে—স্পষ্ট দেখলাম, হাতে রাইফেল নিয়ে এক আর্মড গার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি যেই তার ঠিক সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম অমনি সেই শান্ত্রী ল্যাভেটারির ভেতরে চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কই, কেউ তো বেরোয় না। হঠাৎ দেখলাম দপ্ করে নিভে গেল বাথরুমের আলো। দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে দেখলাম —কেউ নেই কোথাও—আমার শরীরের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। মন থেকে ঝেড়ে ফেললাম দুশ্চিন্তাটা—সারারাত জেগে যে গোরস্থানে একা থাকতে পারে সে এই নাইট-গার্ড দিয়ে ঘেরা রাইটার্সে বসে করবে ভূতের ভয়! কিন্তু—

আশ্চর্য আমি যখন ভাবছি খোয়াব দেখেছি কি না, ঠিক তখুনি আবার দেখলাম, সেই আর্মড গার্ডকে। রাইফেলের সঙ্গীনের নীচের দিকটা শক্ত করে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে—

কে—কে তুমি ? আমি ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে এবার তিন নম্বর ব্লকের সিঁড়ির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর অমনি সেই ভারী জুতোর খট্-খট্ আওয়াজটা আবার শুনতে পেলাম বারান্দার একেবারে পূর্বদিকে (এক নম্বর ব্লক)। আমি

ছুটলাম সেদিকে। তখন সেই শব্দটা দ্রুত চলে গেল পশ্চিমদিকে (পাঁচনম্বর ব্লকে)। আমার মনে হলো—মনে হলো স্যার, সারা বারান্দা জুড়ে—সারা দালান জুড়ে নানা করিডরে বারান্দায় অনেক—অনেক লোক একসঙ্গে ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ি করছে। তাদের দাপাদাপির আওয়াজে গোটা রাইটার্স বিল্ডিং যেন ভেঙে পড়ছে। সেই মাঝরাতে সেই দারুণ শব্দের ভেতরে দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। মনে হল, সারা শরীর টলছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। মনে হয় দারুণ ভয়ে ডুকরে আর্তনাদ করে উঠেছিলাম—থামল জমিরুদ্দিন। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। একসঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলার পরিশ্রমে রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। মাথাটা নীচু করে বলল, জিন পরী ভূত প্রেতকে ভয় পাই না,—এমন কথা দমফাই করে আর বলি না—বলতে পারি না হুজুর।

—জমিরুদ্দিন মিঞার কলিজার জোর আছে স্যার, আর একজন প্রবীণ নাইট-গার্ড মেহবুব এগিয়ে এসে বলল, তাই ও বেঁচে গিয়েছে—তা নাহলে তো তেওয়ারীজীর মত কাণ্ড বাধিয়ে ফেলত—বলেই সে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের মত দুদিকে ঝুলে পড়া গোঁফদুটো আলতো করে পাকিয়ে নিল।

—তেওয়ারী কে? তার কি হয়েছিল?

—আরে না-না, সে কিছু নয়, ফণীবাবু যেন প্রসংগটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই তাড়াতাড়ি বললেন, মেহবুবের কথা ছাড়ুন তো আপনি।

কয়েক মুহূর্ত পরে ফণীবাবু বললেন, তেওয়ারী ছিল সিনিয়র-মোস্ট দারোয়ান। রিটায়ার করতে আর মাত্র ছয় মাস বাকি ছিল। হার্টের দোষও ছিল তার। একদিন শেষরাত্রে দেখা গেল, গেজেটেড অফিসারদের ল্যাভেটারিতে তার ডেড-বডি পড়ে রয়েছে—Plain and simple heart failure! কিন্তু যেহেতু পাঁচনম্বর ব্লকের বাথরুম, অতএব মেহবুবদের ধারণা—

—ও বুঝতে পেরেছি—আমি বললাম। এবার মেহবুব কি দেখতে পেয়েছিল সেটা বলতে বলুন না ফণীবাবু!

ফণীবাবু মেহবুবকে ইঙ্গিত করলেন। মেহবুবের ভারী মাংসল মুখখানা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। মনের ভেতরে কিসের যেন নড়াচড়া

চলছে। আস্তে আস্তে বলল,—হুজুর, রাত্রে এ মোকানমে যো ধুপধাপ শব্দ, দরোয়াজা জানালা খোলাকি আওয়াজ—উসব হামরা পাত্তা দেই না—লেকিন—হঠাৎ থেমে গেল মেহবুব। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটদু'টো শক্ত করে চেপে ধরে যেন কোন কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে বলল, রাতমে কোভি কোভি এইসা আজীব চীজ দেখা যায় যে খুন একেবারে শুখে যায় হুজুর!

মেহবুবের গায়ের রক্ত হিম হয়ে-যাওয়ার ঘটনা বিস্তারিত শুনে আমার শুধু মনে হয়েছিল, রাইটার্সের দোতলার বারান্দাতেই প্রেতের আনাগোনা সবচেয়ে বেশি কেন? কেন ফার্স্ট ফ্লোরেরই বিভিন্ন ব্লকের তরল অন্ধকারে রহস্যময় ছায়াদেহ দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়? আর সবশেষে ফণীবাবুর সেই থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স শুনেও আমার মনে পড়ে গিয়েছিল ইলিয়ট ওডোনেলের (Elliot O'donnell)-এর লেখা সেই Ghost Books: Strange hauntings in Britain বইটির বিচিত্র এক-একটি ঘটনা।

এই গ্রন্থের প্রতিটি সত্য ঘটনার ভেতরে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে প্রেত অধ্যুষিত কোন সাবেক কালের বাড়ি, সবুজ শেওলার পলেস্তারা পড়া কোন ঘাট কিংবা প্রাচীন কোন গাছ সম্বন্ধে সেই অমোঘ সত্য—প্রেতলোকের অভিশপ্ত আত্মাদের বিচরণ ক্ষেত্রের আড়ালে থাকে হয় নিষ্ঠুর কোন বঞ্চনা, না হয় তীব্র কোন প্রতিহিংসার ইতিহাস, কিংবা শোচনীয় অপঘাত মৃত্যুর কোন বেদনাদায়ক দুর্ঘটনা। কিন্তু আজ যা ঘটনা, কাল তা স্মৃতি হয়ে যায়। কালে কালে সে স্মৃতিও মানুষের মন থেকে কুয়াশার মত বিলীন হয়ে যায়। শুধু সেই অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেই জায়গাটা। এইখানেই নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতায়, দুপুরের নির্জনতায় মৃত্যুলোকের পরপার থেকে ঘটনার কুশীলবদের বিদেহী আত্মা তাদের প্রিয়জনদের আকর্ষণে, তাদের কত রঙিন সুখ আর দুঃখের স্মৃতি জড়ানো জায়গায় বারে বারে আসে।

তাই তো ওডোনেল-বর্ণিত লণ্ডনের উপকণ্ঠে সেণ্ট জনস উডের আরণ্যক পরিবেশে পিটক্রেগী হাউসের অলৌকিক এবং রোমাঞ্চকর ঘটনার সঙ্গে রাইটার্সের ফণীবাবুর থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স, মেহবুবের রক্ত শুকিয়ে যাওয়া এবং অন্যান্য ঘটনারও আশ্চর্য সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

১৯০৯ সালে ওডোনেল তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও'নীলের কাছ থেকে

একটা চিঠি পেল। সে জানিয়েছে, দূর সম্পর্কের এক পিসীমার ওয়ারিশ সূত্রে একটা বিশাল বাড়ি পেয়েছে সে। ওডোনেল যদি কয়েকদিনের জন্য এখানে এসে বেড়িয়ে যায় তাহলে সে অত্যন্ত খুশী হবে। ওডোনেল বেকার মানুষ। আউটিং-এর জন্য মনটা চঞ্চল হয়েই ছিল। অতএব সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলো।

আশ্চর্য সুন্দর আর মনোরম এক প্রাসাদ। তার চারদিকের বাগানে ঘনসন্নিবদ্ধ পাম-বীথির নীলাভ ছায়ায় ছুটোছুটি করে খেলা করছে কাঠবিড়ালীর দল। বাগান আলো করে ফুটে রয়েছে রাশি রাশি ড্যাফোডিল। শেষপ্রান্তে এক বর্ষীয়ান ওক গাছের নীচে স্যাঁতসেঁতে ছায়ায় বিশ্রামের জন্য শ্বেতপাথরের একটা বেদী। ওডোনেলের মনে হলো কুয়াশা আর কয়লার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন লণ্ডনের ঘিঞ্জি থেকে সে যেন এক মধুর স্বপ্নের পরিবেশে এসে পড়েছে।

সারাদিন দুই বন্ধুতে গল্পগুজব ও হৈ-হল্লা করে কাটিয়ে দিল। কিন্তু যেই গুঁড়ি গুঁড়ি কুয়াশার মত সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে লাগল অমনি সেই অন্ধকারটাই যেন চেপে এল ও'নীলের হাসি-হাসি মুখে।

—কী ব্যাপার রে—গম্ভীর হয়ে গেলি যে? ব্রাণ্ডি ফুরিয়ে গিয়েছে?

কোন কথা বলল না ও'নীল। শুধু তার বড় বড় দু'টো নীলচোখে ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল। দুঃস্বপ্নের ঘোরে যেন বিড় বিড় করে বলল, এত সুন্দর বাড়িটা বুঝি ছেড়েই দিতে হবে।

—কেন—কেন—কি হয়েছে?

—আর একটু রাত হোক, সব বুঝতে পারবি।

ধীরে ধীরে রাত বাড়ল। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠল। হঠাৎ বাগানের একেবারে শেষে সেই ওকগাছটার নীচ থেকে শোনা গেল—করুণ আর বুকফাটা একটা আর্তনাদের শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে গেল সেদিকে। আর থমকে দাঁড়ালো তাদের হৃৎস্পন্দন। চারিদিকে চাঁদের মেটে-মেটে আলোয় ভরা বাগানের শেষপ্রান্তে সেই ওকগাছের নীচে ঝুপসী অন্ধকারে দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোকের ছায়ামূর্তি। আর সেই ছায়াদেহের মাথায় সাবেক কালের রুপোর চুমকি বসানো টুপি। ভদ্রলোক বাঁদিকের বুকটা চেপে ধরে নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

—কে—কে আপনি ? চিৎকার করে তারা যেই ছুটে গেল ওকগাছের দিকে অমনি মিলিয়ে গেল সেই রহস্যময় ছায়াদেহ। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই ড্যাফোডিলের ঝাড়ের আড়াল থেকে কে যেন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। তারা স্পষ্ট দেখল, অপূর্ব সুন্দরী তন্বী এক রমণী মূর্তি। জ্যোৎস্না আর কুয়াশা দিয়ে গড়া যেন তার অপরূপ অংগসৌষ্ঠব। তারা সামনে যেতেই ঠিক রঙিন প্রজাপতির মতই যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে সে চলে গেল ফার্নগাছের আড়ালে। আবার চারিদিক সচকিত করে সে হেসে উঠল। অভিভূত একটা আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে তারা যে মুহূর্তে তার দিকে অগ্রসর হলো অমনি ফিকে জ্যোৎস্নার ছায়া-ছায়া অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

পরদিন চায়ের টেবিলে বসে ও'নীল বলল, এবার বুঝলি তো, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই কেন গম্ভীর হয়ে যাই !

—কিন্তু—কেন এসব দেখা যায় ?

—যতদূর সম্ভব খোঁজখবর করে জেনেছি, পিসেমশায় এ বাড়িটা কিনেছিলেন এক ব্যারনের কাছ থেকে। সেই ব্যারনের স্ত্রী ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। তাদের স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে বয়সের পার্থক্য ছিল অনেক। ভদ্রমহিলা কোন এক সম্ভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছিল—হঠাৎ চুপ করে গেল ও'নীল। আবার দূরে জানলার বাইরে সেই ঝাপড়া ওক গাছের নীচে বেদীর দিকে চোখদু'টো ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, একদিন নাকি জ্যোৎস্না রাত্রে যখন ব্যারনের স্ত্রী তার প্রেমিকের সঙ্গে ওই বেদীতে বসে কূজন করছিল এমন সময়ে সামনে এসে দাঁড়ালো ব্যারন। তার হাতে রিভলভার। তারপরে আর কি—যা হওয়ার, যা হয়ে থাকে—তাই হলো। সেই ওক গাছের নীচে আদিম অন্ধকারে এক নারীকে কেন্দ্র করে দুইটি পুরুষের অন্তরে জেগে উঠল জিঘাংসা। শুরু হলো দ্বন্দ্বযুদ্ধ। দুই পক্ষই সমানে গুলী ছুঁড়তে লাগল। ব্যারনেসের প্রণয়ী সেই সুদর্শন যুবকের পিস্তলের গুলি এসে লাগল ব্যারনের বুকের বাঁ দিকে !

হতভাগ্য ব্যারন মারা গিয়েছিল। ব্যারনেস তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে কোথায় চলে গিয়েছিল কেউ জানে না—কেমন করুণ তার হতাশ চোখে সুন্দর বাড়িটার দিকে তাকিয়ে নিভু নিভু গলায় বলল ও'নীল, এ অঞ্চলের

লোকের বিশ্বাস সেই ব্যারন আর তার সেই ককেটিশ ওয়াইফের স্পিরিট এই বাগানে দুর্ঘটনার জায়গায় আনাগোনা করে।

এবার রাইটার্সের নাইট-গার্ড মেহবুব কি দেখেছিল—সেই আলোচনায় যাওয়া যাক।

মেহবুবের সেদিন ডিউটি ছিল দোতলার চারনম্বর ব্লকে। একটানা পায়চারি করতে করতে পা-দুটো ধরে গিয়েছিল। বেয়ারাদের টুলে বসতে না বসতে চোখদুটো জড়িয়ে এসেছিল।

ধপ্—হঠাৎ ভারী কিছু পড়ার শব্দ হলো। ছুটে বারান্দায় গিয়েই আঁতকে উঠল—লিনোলিয়াম মোড়া প্রোটেকটেড এরিয়ার অলিন্দে আড়াআড়িভাবে পড়ে রয়েছে একটা লাশ। তার পরনে খুব দামী স্যুট। সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। এসে পড়ল পুলিস, নাইট-গার্ড দারোয়ান, এল নাইট-ডিউটির প্রায় সব স্টাফ। তারা সামনে গিয়ে দেখল সেই বারান্দায় ডেড-বডির কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। শুধু বিভিন্ন ব্লকের মুখে করিডরের ঘোলাটে আলো বুকে নিয়ে দীর্ঘ বারান্দাটা যেমন গা এলিয়ে পড়ে থাকে তেমনি পড়ে রয়েছে।

রাইটার্সের দোতলার এই অলিন্দের ইতিহাস আজ আর কারো অবিদিত নেই।

এখন থেকে আটচল্লিশ বছর আগে আধুনিক কালের ডালহৌসি স্কোয়ার যাঁদের নামের পুণ্যস্মৃতি বহন করছে বাংলার সেই অসমসাহসী তিন তরুণ বিনয়কৃষ্ণ বসু (২২ বছর), বাদল (সুধীর গুপ্ত ১৮ বছর) আর দীনেশ গুপ্ত (১৯ বছর) নিখুঁত সাহেবী পোশাকে সেজে এসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি এই রাইটার্স আক্রমণ করেছিল। তারা পশ্চিম দিকে পাঁচনম্বর ব্লকের সিঁড়ি বেয়ে বীরদর্পে দোতলায় উঠে এসে সোজা কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টার-জেনারেল কর্নেল সিম্পসনকে হত্যা করেছিল। মুহূর্তে যেন মহাপ্রলয় নেমে এসেছিল রাইটার্সে। গুলির শব্দে, বারুদের ধোঁয়ায় আর দূরাগত মেঘগর্জনের মত মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল চারিদিক। আর পুলিসের বড় কর্তা চার্লস টেগার্টের পরিচালনায় রাইফেলধারী অগুনতি গোর্খা সৈন্য

একদিকে আর একদিকে মৃত্যুপাগল তিনটি আগ্নেয় শিশুর ভেতরে শুরু হয়েছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ—ইতিহাসে যার নাম—'বারান্দা-ব্যাটল'! কিন্তু—

একসময় সব থেমে গিয়েছিল। রাইটার্সে শান্তি নেমেছিল। শ্মশানের শান্তি। দোতলার পূর্বদিকের একেবারে শেষ ঘরটাতে (এক নম্বর ব্লকে) ঢুকে চুপচাপ কি করছে এই তিন সিংহ-শিশু! মেরীর নাম জপতে জপতে ঘরে উঁকি দিয়ে টেগার্ট দেখেছিল একজন (বাদল) চেয়ারে বসে টেবিলে মাথাটা এলিয়ে দিয়েছে। আর দুইজন ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে। চারিদিকে তাজা রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে।

টেগার্ট ভেতরে এল। কিন্তু বড্ড দেরী করে ফেলেছিল। সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। টেবিলের ওপরে তিনজনের তিনটি রিভলবার থেকে তখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আর তার পাশেই ছড়িয়ে রয়েছে সাদা সাদা গুঁড়ো—পটাশিয়াম সায়ানাইড! কিছুই বুঝতে বাকি রইলো না টেগার্টের। এই মারাত্মক উগ্র বিষ খেয়ে আর তাদের সর্বশেষ গুলিটির সদ্ব্যবহার করে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছে ওরা।

অগ্নিযুগের এই তিন মহানায়কের শহীদ হওয়ার সেই মহৎ প্রচেষ্টার সাক্ষী হয়ে রয়েছে আজও দোতলার একনম্বর ব্লকের সেই ঘর।

তাদের সঙ্গে অভূতপূর্ব আর দুঃসাহসিক সংগ্রামের এই সব আলোচনার শেষে কেয়ার-টেকারকে বললাম, এবার ফণীবাবু আপনার 'থ্রিলিং' এক্সপিরিয়েন্সটা বলুন!

ফণীবাবু কোন কথা বললেন না।

মাথা নীচু করে অস্ফুট স্বরে যেন আপনমনেই বললেন, বারান্দা-ব্যাটলের এত সব ডিটেলস আমি জানতাম না—আপনি যা বললেন তাতে আমার অভিজ্ঞতা আর খুব বেশী রোমাঞ্চকর মনে হবে না।

—তবুও বলুন না!

—বছর এগারো আগের কথা, ফণীবাবু বলতে শুরু করলেন, হঠাৎ একটা সারকুলার পেলাম—বিনয়-বাদল-দীনেশের প্রতিকৃতি স্থাপিত করা হবে সেই দোতলার বারান্দাতেই। একটু থেমে আবার বললেন ফণীবাবু, সারকুলারে আরও লিখেছিল—যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী হেমন্তকুমার বসুর উদ্যোগে এবং মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই উপলক্ষ্যে

একটি অনুষ্ঠান হবে—৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৭। প্রতিকৃতি তিনটিতে মাল্যদান করবেন রাজ্যপাল ধরমবীব, ইত্যাদি।

এই সারকুলার পেলাম সেভেন্থ ডিসেম্বর দুপুরে। সময় বেশী নেই। পরের দিনই ফাংশান। সারা দুপুর ফরাশ, মালী, মজুর-ভিস্তিওয়ালাদের সংগে থেকে থেকে চারিদিক ঝাড়পোছ এবং সাজানো-গোছানোর কাজের তদারকি করেছি তবুও মন থেকে দুশ্চিন্তা যায় না। মেন ব্লকেব বাঁদিকে ফুলের টবটা ঠিক আছে তো— সি. এম.'এব ঘরের কার্পেটটা পাল্টে দিয়েছে তো।

বাত্রে বাউণ্ডে বেরিয়েছি। সেদিন কাজের চাপে বাত একটু বেশীই হয়েছিল। শীতও পড়েছিল সেদিন খুব জাঁকিয়ে। ঘন কুয়াশায় টেলিফোন-ভবনটাকে কেমন একটা দৈত্যের মত মনে হচ্ছিল। এপর্যন্ত বলে থামলেন ফণীবাবু। হঠাৎ তাব চোয়ালদুটো কেমন শক্ত হয়ে উঠল। কেমন চাপা চাপা অস্পষ্ট গলায় বললেন, ভূত-প্রেতে কখনোই বিশ্বাস করি না। আমার স্টাফেরা নানা বকম কথা বলে। আমিও শুনেছি, বাইটার্সের পশ্চিম দিকের কাঠের সিঁড়িতে ভারী জুতোব আওয়াজ, তবুও আমাব মনে হয়েছে বিনয়-বাদল-দীনেশের ওই সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসাব কাহিনীটা এত বেশি মনে গেঁথে রয়েছে যে—

—যাক সেসব কথা— কি দেখেছিলেন বলুন ?

—সেদিন হলো কি, মেন ব্লকেব পাচনম্বব ঘবের (কর্নেল সিম্পসন এই ঘরে বসতেন) সামনে আসতেই ধক্ করে উঠল বুকের ভেতরটা। স্পষ্ট দেখলাম, ওই ঘর থেকে লম্বা চেহারার এক সাহেব জোর পায়ে হেঁটে চলেছে পুবদিকে।

প্রোটেকটেড এরিয়া। স্যাবোটেজ করার কত ফিকির খোঁজে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি। তাই আমিও তাকে ফলো করলাম। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলেন ফণীবাবু। কোথায় গেল সেই সাহেব ?

কেমন আচ্ছন্নের মত জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন ফণীবাবু, সাহেবের শ্যাডোটা খুব স্পীডে পুবদিকের সবশেষের সেই ঘরের সামনে এসেই কোথায় মিলিয়ে গেল। আমিও মরিয়া হয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিলাম আর সংগে সংগে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল—থেমে গেলেন ফণীবাবু। তাঁর চোখেমুখে আতংকের চিহ্ন ফুটে উঠল।

ফণীবাবু হয়তো সেই দৃশ্য দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন বা ভয় পেয়েছিলেন। তাঁর বিবরণ শুনে আমি কিন্তু এতটুকু অবাক হইনি। দেশী-বিদেশী বহু বইতে লেখা ভুতুড়ে ঘটনা (প্রত্যেকটি সত্য ঘটনা) পর্যালোচনা করে দেখেছি এবং Occult science'এর একটি তথ্যও আছে—মৃত্যুর পরপার থেকে বিদেহী আত্মা শুধুই যে তার পুরানো জায়গায় আসে তা নয়, পুরানো পটভূমিতে, পুরানো সেই ঘটনার দৃশ্যটাও তারা কখনো কখনো পুনরাভিনয় করে যায়। তাই—

ফণীবাবু যদি দেখে থাকেন সেই ঘরের কাজলকালো জলের মত অন্ধকারের স্রোতে ভাসছে দু'টো ছায়াদেহ, আর একটি আবছা কালো ছায়ামূর্তি টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—এই কথাগুলো কেয়ার-টেকার সাহেবকে বুঝিয়ে বলতে যাবো এমন সময়—

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং—টেলিফোন বেজে উঠল। ধরলেন ফণীবাবু—হ্যালো—কি-কি বললেন ?—আগুন! কোথায়—সে কী! রিসিভার ফেলে রেখে খুব বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন ফণীবাবু। বললেন, দোতলার মেন ব্লকের ইলেকট্রিকের তারে আগুন স্পার্ক করছে। একটু হেসে বললেন, এখুনি আমাকে ছুটতে হবে—এই আমার চাকরি—বুঝলেন—নমস্কার।

৮

গভীর রাত্রে আলিপুরে চব্বিশ পরগনার কালেক্টারের রেসিডেন্সে পিআনোর এক রহস্যময় বাজনা শোনা যেত—

পিআনোর একটি স্বর।

এবার পুরানোকালের কোন জীর্ণ, নোনাধরা বাড়ি নয়, পুরু শ্যাওলার আস্তরণ পড়া কোন ঘাট নয়, কোন প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ কি কোন দেবদেবীর থান নয়—এবার পিআনোর রহস্যময় আর করুণ একটা স্বর আলিপুরের অভিজাত সমাজকে কেমন করে আলোড়িত করে তুলেছিল, ম্যাজিস্ট্রেট, এস. পি, এস. ডি. ও.—সমস্ত প্রশাসনিক মহলকে করে দিয়েছিল বিপর্যস্ত

তারই বিচিত্র ইতিবৃত্ত পুরানো কলকাতার ইতিহাসে যেমন আছে ঠিক-তেমনি বলা হলো—

আশ্চর্য সেই সুর! রাত্রি শেষের স্তব্ধতার বুকের ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে আসে। আর সেই সুরের মূর্ছনায় যেন ভোরের প্রশান্তিই ছড়িয়ে পড়ে। আবার কখনো নির্জন দুপুরে সেই সুরের ঝংকারে ঝংকারে মনটা ভেসে ভেসে চলে যায় জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি-বিস্মৃতিকে পিছনে ফেলে অনেক—অনেক দূরে কোন অজানা লোকে। এমনও হয়েছে কখনো, নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতাকে সচকিত করে বেজে উঠেছে সেই আশ্চর্য সুর। আব মনে হয়েছে, সেই দূরাগত মেঘমন্দ্র রাগিণী যেন ব্যাকুল হয়ে আহ্বান জানাচ্ছে লোকান্তপারের অশরীরীদের। কিন্তু—

কোথা থেকে আসে সেই মৃদু ও মধুর শব্দতরঙ্গ? কোন নিপুণ শিল্পী ললিত অঙ্গুলিবিন্যাসে সৃষ্টি করতো সুরের সেই মায়াজাল, বহু অনুসন্ধান করেও জানতে পারে নি আলিপুরের অধিবাসীরা।

কিন্তু পিআনোর সেই সুমধুর সংগীত প্রেসিডেন্সি জেলের উঁচু পাঁচিল ডিঙিয়ে বিনিদ্র কয়েদীদের কানেও আসে। আর তারাও সব যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে কেমন একটা মধুর অনুভবের সুখে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তারা চোখদুটো কুঞ্চিত করে বুঝতে চেষ্টা করে ঠিক কোন দিক থেকে আসছে সেই সুরেলা শব্দলহরী। অন্ধকার আদিগংগা পাড়ি দিয়ে যেতে যেতে নৌকার মাঝিদের বৈঠাও থেমে যায়। নিশুতি রাতে জলের ওপর দিয়ে বয়ে আসা সেই ছন্দোসুরভিত শব্দটা তাদের বিস্মিত করে। খালের ডানদিকে জেলখানার উঁচু পাঁচিল আর বাঁদিকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠি। মাঝিদের মনে হয়, হাকিম সাহেবের বাংলোর ছাতে বসে যেন কেউ বিভোর হয়ে বাজিয়ে চলেছে। জেলখানার নাইট-গার্ডরা পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। খৈনির টিপ ঠোটে গুঁজে দিয়ে সংগীকে বলে, শুনতা হ্যয়—ক্যা বাঢ়িয়া বাজা—

—লেকিন ভাইয়া—কঁহাসে আ রহী হ্যয় উ আবাজ?

এই রহস্যময় বাজনার সুরকে কেন্দ্র করে আলিপুরের জনজীবন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ডালপালা বিস্তার করে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। কেউ বলে, চাঁদনী রাত্রে এক অপূর্ব সুন্দরী বিদেশিনী ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠি থেকে বেরিয়ে যেন বাতাসে ভেসে ভেসে

আদিগঙ্গা পেরিয়ে জেলখানার প্রাচীরের কাছে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই মেমসাহেবই বাজায় পিআনো—আবার কেউ বলে আলিপুরের ব্রীজের কাছ থেকে জেলখানা পর্যন্ত টালিনালা জায়গাটা মোটেই ভালো নয়। এই খালের দু'পাশে বনতুলসীর গভীর জঙ্গলে একসময় ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। সুতানুটি থেকে যেসব তীর্থযাত্রী কালীঘাটে যেত তাদের খুন করে ফেলে দিত খালের জলে। তাদেরই স্পিরিট নানা রকম কাণ্ডকারখানা করে।

স্কুপ নিউজ করবে বলে বিখ্যাত একটি দৈনিকের দু'জন স্টাফ রিপোর্টার এল আলিপুর অঞ্চলে। তাদের সঙ্গে ছিলেন ভুতুড়ে কাহিনীর এক লেখক। তাঁরাও শুনতে পেলেন পিআনোর সেই মধুর করুণ ক্ষীণ স্বর চারিদিকের বন-বনান্তকে আচ্ছন্ন আর বিবশ করে দিয়ে ভেসে আসছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠি থেকে। কিন্তু কাগজে সংবাদটা ছাপানোর আগে কালেক্টারের সঙ্গে তাঁরা একবার দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হলো না।

হবে কেমন করে? এসব হলো ১৯২৬ সালের ঘটনা। চব্বিশ পরগনার কালেক্টার তখন উইলিয়ম মেকপীস থ্যাকারে। থ্যাকারে ডাকসাইটে ও জবরদস্ত হাকিম। তাঁর দাপটে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। আর তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। বাংলার চরমপন্থী তরুণ বিপ্লবীরা কংগ্রেসের অহিংসা আর আপোষনীতিতে বীতশ্রদ্ধ এবং অধৈর্য হয়ে সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সুযোগ পেলেই সাহেব খুন করছে। বোমা ছুঁড়ছে। থ্যাকারে সাহেবের ঘুম নেই। সময় নেই নাওয়া-খাওয়ার।

অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর ম্যাজিস্ট্রেট তাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হলেন। পিআনোর বাজনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই গম্ভীর হয়ে গেলেন থ্যাকারে। আস্তে আস্তে বললেন, লোকে বলাবলি করছে বটে শব্দটা নাকি আমারই বাংলো থেকে শোনা যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে আবার একটু যেন সংযত হওয়ার চেষ্টা করে বললেন, দেখুন মশাই, এই মিস্টিরিয়াস মিউজিক আমাকে খুবই চিন্তিত করে তুলেছে। আমি এস. পি.'কে বলেছিলাম, তাঁর এণ্টায়ার পুলিস ফোর্স লাগিয়ে বহু খোঁজ করেছেন। কিন্তু কোন ক্লু পাওয়া যায় নি।

—আচ্ছা, আপনার কোন আত্মীয় কি পিআনো বাজাতে জানতেন? তাঁর কোন unnatural death হয়েছে এ বাড়িতে?

—No-No, not at all আমার উর্ধ্বতন চোদ্দ পুরুষের ভেতরে কস্মিনকালেও কেউ কখনো পিআনো বাজাতে জানতো না।

ঘরে অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা থমথম করতে লাগল। রিপোর্টারদের সংগী সেই লেখক ভদ্রলোক মরিয়া হয়ে বললেন, আচ্ছা আপনার বাংলোর কেউ শুনেছে এই বাজনা—যদি এমন কারো সংগে আলাপ করিয়ে দেন স্যার—

কোন কথা বললেন না থ্যাকারে। বেয়ারাকে ডাকলেন। বললেন, মিসেস গ্ল্যাডিংসকো বোলাও—

এক মাঝবয়সী মহিলা এলেন। পিআনোর সেই রহস্যময় বাজনা সম্বন্ধে গ্ল্যাডিংস তার অভিজ্ঞতার যে বিবরণ দিয়েছিলেন তারই ভিত্তিতে এ. এফ. এম. আব্দুল আলী লিখেছিলেন তার বিখ্যাত বই 'গোস্ট স্টোরিজ অফ ওল্ড ক্যালকাটা' (Ghost stories of old Calcutta)।

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, আলীসাহেব কিন্তু বিশ বছর পরে লিখেছিলেন তাঁর এই বইটি। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে পিআনোর এই বিচিত্র ইতিবৃত্ত লেখার কারণগুলো এখানে বলা হলো।

১৯২৬ সালে মিসেস গ্ল্যাডিংসের সংগে লেখকের প্রথম সাক্ষাৎকারের কিছুদিন পরেই চব্বিশ পরগনার কালেক্টার থ্যাকারের কার্যকাল শেষ হয়ে যায়। তাঁর সংগে গ্ল্যাডিংসও বিলেতে ফিরে যান।

এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯)। লণ্ডনে ইভ্যাকুয়েশানের ধুম পড়ে গেল। সেই সময় গ্ল্যাডিংস লণ্ডন ছেড়ে বহুদূরে কোন এক জায়গায় গিয়ে নিতান্ত আকস্মিকভাবে পিআনোর সেই রহস্য জানতে পারেন—জানতে পারেন মৃত্যুর পরপার থেকে কোন সুরশিল্পীর বিদেহী আত্মা গভীর নিশীথে চব্বিশ পরগনার কালেক্টারের কোয়ার্টারের সেই রুদ্ধ ঘরে মাথা খোঁড়ে কিসের মর্মান্তিক যন্ত্রণায়।

১৯৪৫ সালে বৃদ্ধা মিসেস গ্ল্যাডিংসকে আবার আসতে হয়েছিল শহর কলকাতায় তাঁর মেয়ের কাছে। পিআনোর ফ্যাণ্টম মিউজিকের রহস্যের আড়ালে বেদনাদায়ক ঘটনাটা লেখককে জানানোর প্রবল বাসনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাই গ্ল্যাডিংস আলীসাহেবের সংগে যোগাযোগ করে পিআনোর

যাবতীয় বৃত্তান্ত বিশদ বলেছিলেন। এই দুই-দুইবারের (১৯২৬ খ্রী. এবং ১৯৪৫ খ্রী.) দেখাসাক্ষাতে মিসেস গ্ল্যাডিংস যেসব তথ্য বলেছিলেন তাকে কেন্দ্র করেই আলীসাহেব লিখেছিলেন পিআনোর রহস্যাচ্ছন্ন মধুর আর বেদনাদীর্ণ সেই সুরের চাঞ্চল্যকর ইতিবৃত্ত।

১৯২৬ সালে চব্বিশ পরগনার কালেক্টর মি. থ্যাকারের উপস্থিতিতে মিসেস গ্ল্যাডিংসের বক্তব্য তাঁর নিজের জবানীতেই পরিবেষণ করা হলো—

আমি বছর তিনেক আগে গভর্নেসের চাকরি নিয়ে মি. থ্যাকারের কাছে এসেছি। তাঁর শিশুপুত্র রবার্ট থ্যাকারের লেখাপড়া এবং দেখাশোনার যাবতীয় দায়িত্ব আমার।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের এই বাংলোর 'সারাউণ্ডিংস'টা আমার খুব ভালো লাগে। চারিদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বিশাল এই দোতলা বাড়িটার সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা লন। তার দু'পাশে সারি সারি আম আর লিচু গাছ। এই বাড়ির বাঁদিকের বাউণ্ডারি-ওয়ালের গা ঘেঁসে বয়ে চলেছে টালিনালা। জোয়ারের সময় জল যখন ফুলে-ফেঁপে ওঠে তখন কোয়ার্টারের গায়ে ঢেউয়ের ছলাং ছলাৎ শব্দ শোনা যায়। আর ডান দিকেই পাহাড়ের মত উঁচু জেলখানার বিশাল প্রাচীর। চারিদিক খুব শান্ত আর নিরিবিলি। পাখির ডাক, আর বাতাসের শাঁ শাঁ শব্দে নিঝুম দুপুরটা কেমন স্বপ্নের মত মনে হয়।

দোতলায় আমরা চারটি মাত্র প্রাণী। আমি, মি. থ্যাকারে, মিসেস থ্যাকারে এবং তাঁদের চার বছরের ছেলে রবার্ট। আর গ্রাউণ্ড-ফ্লোরে কুক, বাট্‌লার, খিদমতগার, চাপরাশি, বরকন্দাজ, সব মিলিয়ে জনাদশেক লোক থাকে। কিন্তু নীচের বড় হলঘরের (সার্ভেণ্টরা এখানে থাকে) পাশেই একটা ছোট কামরা সবসময়ই তালা দেওয়া থাকে। মিসেস থ্যাকরেকে জিজ্ঞাসা করেছি অমন সুন্দর দক্ষিণ খোলা এবং টালিনালা ফেসিং ঘর বন্ধ থাকে কেন? মিসেস থ্যাকারে জানিয়েছিলেন, ও ঘর নাকি প্রিডিসেসারদের নানা টুকিটাকি জিনিসে একেবারে ঠাসা হয়ে গোডাউনের মত পড়ে রয়েছে।

কিন্তু এই ঘরের প্রসঙ্গ উঠলেই মিসেস থ্যাকারের চোখে-মুখে কেন যেন অস্বস্তির ছায়া ফুটে উঠতো। আমার মনে হতো, তিনি কি যেন

লুকোতে চাইতেন। তাই আমারও কিউরিওসিটি বেড়ে গেল। এখানে এই ঘরে কি থাকে, কোন কোন জিনিসের স্তূপ, কেন এই বাংলোর সবচেয়ে ভালো ঘরটি সর্বদা বন্ধ থাকে—এসব জানার আগ্রহে মনটা ছটফট করতো।

একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চাঁদের আলোয় চারিদিক দিনমানের মত ফুটফুট করছে। আমার ঘরের সামনে দোতলার খোলা বারান্দায় এলাম। বাগানের দু'পাশে দেবদারুবীথি আর শিরীষগাছের নীচে আলোছায়ার জাফরি কেটেছে। কৃষ্ণচূড়ার ঝিরিঝিরি পাতায় বাতাস আকুলি-বিকুলি করছে। চাঁদের আলো বুকে নিয়ে দুলছে টালিনালার জল। আমার মনে হলো, আমি যেন স্বপ্নের একটা রাজ্যের ভেতরে এসে পড়েছি। অপরূপ—সত্যিই খুব লাভলি!

এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস। তাঁর সুডোল মুখে বিষণ্ণতার ছায়া থমথম করতে লাগল। খুব আস্তে আস্তে বললেন, লাভলি সেই মুনলাইট চোখের পলকে হয়ে উঠেছিল টেরিবুলি ভ্রেডফুল।

—কেন—কেন—কি হয়েছিল? রিপোর্টার এবং লেখক একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

কোন কথাই বললেন না গ্ল্যাডিংস। শুধু হাসি মিলিয়ে গিয়ে কেমন শক্ত হয়ে উঠল তাঁর মুখের পেশীগুলো। কিছুক্ষণ পর কখনো তীব্র উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে, কখনো থেমে থেমে প্রচণ্ড আবেগে বলে গিয়েছিলেন তাঁর সেই ভয়ংকর দুঃস্মৃতি—

গ্ল্যাডিংস যখন চাঁদের আলোর স্বপ্নে বিভোর সুষুপ্ত পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক তখুনি দূর—খুব দূরে থেকে কার যেন চাপা কান্নার আওয়াজ তাঁর কানে এল। কে যেন বুকভাঙা শোকে গুমরে গুমরে কাঁদছে। হয়তো বেয়ারা চাপরাশিদের কারো দেশ থেকে চিঠিতে কোন দুঃসংবাদ এসেছে।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে নেমে এলেন গ্ল্যাডিংস। কান্নার শব্দ এবার আরো স্পষ্ট, আরও জোরালো বলে মনে হলো! কই, না তো—বেয়ারা-বাটলাররা তো যে যার তক্তাপোশে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছে।

কয়েকমুহূর্ত সেই আবছায়া অন্ধকার একতলাটায় দাঁড়িয়ে থাকতে

থাকতে তাঁর মনে হলো, ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজটা আসছে সেই রুদ্ধ ঘর থেকে। সেই ঘরের 'কী-হোলে'র ভেতরে চোখ রাখতেই কেমন শিরশির করে উঠল তাঁর সারা শরীর। মনে হলো, তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে যেন হিমশীতল জলের একটা স্রোত বয়ে চলেছে হুহু করে। ঘরের ভেতরে ছায়া-ছায়া অন্ধকারে টেবিলের মত কি একটা যেন জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদছে এক রমণীর ছায়া দেহ !

কে—কে ওখানে ? কে আপনি ? চিৎকার করে এই কথাগুলো বলতে চাইলেন গ্ল্যাডিংস। কিন্তু পারলেন না। কে যেন সাঁড়াশি দিয়ে জোর করে তাঁর গলা চেপে ধরেছে। ভয়ে উত্তেজনায় তাঁর সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতরটা। তবুও—তবুও তিনি মরিয়া হয়ে চিঁ চিঁ করে বললেন—কে—আপনি কে ?

সংগে সংগে স্তব্ধ হয়ে গেল সেই কান্নার শব্দ। গ্ল্যাডিংসের গলার আওয়াজ পেয়ে প্রধান খিদমতগার এবং কয়েকজন খানসামা জেগে উঠল। তারা আলো জ্বালিয়ে বাংলোর চারিদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল—কোথাও কিছু নেই। শুধু সেই বন্ধ ঘরটার ভেতরে চাপ চাপ জমাট অন্ধকার অচল আর অনড় হয়ে রয়েছে, যেমন থাকে।

থ্যাকারের আগে চার-পাঁচজন ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের সংগে চাকরি-করা প্রবীণ সেই খিদমতগার অচ্ছয়প্রসাদ বলল, মেমসাহেব ইয়ে কমরে আচ্ছা নহী হ্যয়—হিঁয়া জিন-পরী—

—আপনি যে কেন মিডনাইটে এই পড়ো ঘরটাতে এসেছিলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস, ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মিসেস থ্যাকারে। একটু থেমে আবার অস্ফুট স্বরে বললেন, আপনাকে কত বার বলেছি, মিস্টারের প্রত্যেক প্রিডিসেসারদের 'নোট' থাকে—এই ঘর যেন না খোলা হয়—এই রুমটার না কি একটা ট্র্যাজিক হিস্ট্রি আছে।

—এই রুমে কেউ সুইসাইড করেছিল ?

—নো। সেটা কোন প্রিডিসেসারের নোটে লেখা নেই। স্ট্রেঞ্জ !

জবরদস্ত ম্যাজিস্ট্রেট মি থ্যাকারে কিছুই বললেন না। শুধু আরও বেশি গম্ভীর—আরও বেশি চিন্তিত হয়ে গেলেন। গোস্ট-মোস্ট কোন কালে তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—এসব ওই টেররিস্ট পার্টির গুণ্ডাগুলোর কাজ। কে জানে, তাঁর কোন মারাত্মক সর্বনাশ

করার ফিকিরে তাঁর বাংলোর আশপাশে ঘুরছে। অতএব—এস. পি.'কে বলে তাঁর রেসিডেন্সে আর্মড গার্ডের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিলেন।

এই ঘটনার ঠিক তিন মাস পরে আবার চব্বিশ পরগনার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রেসিডেন্সে ঘটে গেল আর এক অলৌকিক কাণ্ড।

সেদিন ছিল বর্ষার রাত। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। আর থেকে থেকে মাথা পাগলা এক-একটা দমকা বাতাসের ঝড়ে বাগানের গাছগাছালি থেকে বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টির মত জল ঝরে পড়ছিল। সেদিন কেন যেন অনেক রাত পর্যন্ত কিছুতেই ঘুম আসছিল না গ্ল্যাডিংসের। মাথা, কানের দুই পিঠ আগুনের মত তেতে উঠেছিল। জানালা খুলে দিতেই ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা তাঁর নাকে-মুখে আছড়ে পড়ল শীতল জলের স্রোতের মত। ধীর পায়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন জানালায়।

বাগানের তরল অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভিজে ভিজে গাছগুলোর পাতায় পাতায় ঝড়ো বাতাসের শব্দ বেজে চলেছে—ঝমর-ঝম্। সেই বাতাস আর বৃষ্টির একটানা শব্দকেও ছাপিয়ে হঠাৎ তাঁর কানে এল, পিআনোর দূরাগত একটি মৃদু করুণ সুর। গ্ল্যাডিংসের মনে হলো, বৃষ্টি-ঝরা গভীর রাত্রে বেদনাদীর্ণ সেই সংগীতের সুরে যেন যুগযুগান্তরের বিরহীদের কান্না উত্তাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু—

আশ্চর্য। যে বাংলোয় পিআনো কেন, কোন বাদ্যযন্ত্রের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, সেখানে কে বাজাতে পারে এই 'ইনস্ট্রুমেণ্ট'? এসব কথা—এমন কি কয়েক মাস আগের সেই রমণীর রহস্যময় ছায়ামূর্তির কথাও গ্ল্যাডিংসের মনে হলো না। বরং পিআনোর সেই মধুর সুরের মূর্ছনায় কোন অনিশ্চিত ভয় কিম্বা গা ছমছম-করা কোন অস্বস্তিকর অনুভূতির বদলে নিবিড় একটা প্রশান্তির ভেতরে বিলীন হয়ে গেল তাঁর মন।

তিনি সম্মোহিতের মত নীচে নেমে এলেন। তাঁর মনে হলো আওয়াজটা আসছে সেই অভিশপ্ত রুদ্ধ ঘর থেকেই। যেই তিনি নিঃশব্দ পায়ে সেই ঘরের দরজার কাছে এলেন অমনি পিআনোর সেই ছন্দোময় ঝংকারের অনুরণন যেন ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে অন্ধকার বাগানের দিকে অপসৃয়মান হয়ে যেতে লাগল। গ্ল্যাডিংসও নেমে গেলেন বাগানে। সেই বাজনার শব্দকে অনুসরণ করে তিনি ঘনসন্নিবদ্ধ সেই দেবদারুবীথি ছাড়িয়ে, শিরীষ আর বট-পাকুড়ের নীচ দিয়ে পামগাছগুলোর নীচে প্রেতপুরীর জমাট অন্ধকারের

দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর পা-দুটোর ওপরে যেন তাঁর কোন বশ নেই। তাঁর সমস্ত সত্তার ভেতরে, তাঁর মগ্ন-চৈতন্যের ভেতরে যেন ধ্বনিত হচ্ছে পিআনোর সেই রাগিণী। বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছে তাঁব চেতনা। মাথার ভেতরে ফেটে পড়ছে রক্তের উচ্ছ্বাস। শুধু বিক্ষুব্ধ মনের ভেতরে আগুনের মত জ্বলছে একটা—একটা মাত্র বাসনা—মধুব মনমাতানো সেই সুরের শিল্পীকে দেখতে হবে--জানতে হবে, কে সে!

কিন্তু আশ্চর্য—খুবই আশ্চর্য' গ্ল্যাডিংস যত এগিয়ে চলেছেন, বাজনার সেই আওয়াজও তত দূরে সরে সরে যাচ্ছে। কাঁটা গাছেব ঝোপে লেগে তাঁর স্কার্ট ছিঁড়ে তাব খানিকটা অংশ মরাসাপের মত দুলছে। পা-দুটোয় বিছুটি পাতা লেগে চিন্ চিন্ কবে জ্বলে যাচ্ছে। কোনদিকেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। বাগানের একেবারে শেষ সীমানায় বনতুলসীর ঘন জংগলের ভেতর দিয়ে যেই তারকাটার বেড়া ডিঙিয়ে তিনি জেলখানার প্রাচীরের সামনে এসে পড়লেন অমনি চারিদিক কাঁপিয়ে নৈশপ্রহরীর আতংকিত চীৎকার শোনা গেল—হু গোজ দেয়া-র ?

আর সার্চলাইটের আলো বন্দুকের গুলির মত আছড়ে পড়ল গ্ল্যাডিংসের গায়ে। নাইট-গার্ড অস্ফুট আর্তনাদ করে বলে উঠল, ক্যা তাজ্জব কী বাত—ম্যাজিস্টর সাহেবকো কোঠী কী মেমসাব- -

এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস। হয়তো সেই দুর্যোগ রাত্রির ভয়ংকর দুঃস্মৃতির পীড়নেই মাথা নীচু করে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপরে যেন বহু—বহু দূর থেকে ক্ষীণ অস্ফুট গলায় বললেন, নিশির ডাকে নয়। বেশ স্পষ্ট মনে আছে পিআনোর সেই আর্টিস্টকে দেখার জন্যেই আমি সেই রাত্রে জংগল ভেঙে ছুটে গিয়েছিলাম—

—স্টপ ইট্—থ্যাকারে হুংকার দিলেন। প্রায় ধমকের সুরেই মিসেস গ্ল্যাডিংসকে বললেন, আপনি এবার ভেতরে যান।

কেমন করুণ আর অসহায় চোখে লেখক আলীসাহেব এবং রিপোর্টারদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে চলে গেলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস। মনে হলো তাঁর আরও কিছু বক্তব্য ছিল।

—থিওসফিক্যাল সোসাইটির জার্নালে ওসব ট্র্যাশ ভূতপ্রেতের গালগপ্পো পড়ে পড়ে ভদ্রমহিলার মাথাটাই বিগড়ে গিয়েছে, কটু গলায় মন্তব্য করলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।

কিন্তু গালগল্প বা ট্র্যাশ বলে যতই উড়িয়ে দিক না কেন, মিসেস থ্যাকারের পীড়াপীড়িতেই হোক কিম্বা আর যে কোন কারণেই হোক কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিলেতে ফিরে গিয়েছিলেন।

এল ১৯৪৫ সাল।

এই বিশ বছরে অনেক বদলে গিয়েছে দুনিয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব শেষ হয়েছে। অগ্নিমূল্য হয়ে গিয়েছে দৈনন্দিন জিনিস। কমে গিয়েছে মানুষের মূল্যবোধ। পৃথিবীজুড়ে যত পরিবর্তনই হোক না কেন, হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানে দু'টো নরনারীর মনের ভেতরে কিন্তু একটা নিদারুণ আক্ষেপ মাথা খুঁড়ছিল—চব্বিশ পরগনার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রেসিডেন্সে পিআনোর সেই মেলোডির মিস্ট্রিটা আজও জানা গেল না।

হয়তো তাদের দুইজনের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি বা উইলফোর্সের জন্যেই কেমন করে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে মিসেস গ্ল্যাডিংস জানতে পেরেছিলেন সেই বিদেহী আত্মার সুরলহরীর ইতিবৃত্ত আর 'গোস্ট স্টোরিজে'র লেখক আলীসাহেবকে সবিস্তারে জানিয়েছিলেন সেই আলোচনায় যাওয়া যাক।

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং—

কোন এক গ্রীষ্মের দুপুরে আলীসাহেবের পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে ফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো—ইয়েস আব্দুল আলী স্পিকিং—গুড আফটারনুন, কে? মিসে-স—গ্ল্যা-ডিং-স! ইয়েস্-ইয়েস— ও! সেই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি. থ্যাকারের গভর্নেস?…

আরও কিছুক্ষণ কুশলপ্রশ্ন বিনিময় এবং বিভিন্ন কথাবার্তার পরই রিসিভার রেখে দিয়েই বেরিয়ে পড়লেন আলীসাহেব।

আলিপুরে বেকার রোডে মিসেস গ্ল্যাডিংসের জামাইয়ের বাড়িতে এলেন আলীসাহেব। বেয়ারা দিয়ে খবর পাঠাতেই তখুনি এলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস। মাথার চুলে কাশফুলের রঙ ধরেছে। প্রতিমার মত সেই সুডৌল মুখখানার রেখায় রেখায় বার্ধক্যের নির্ভুল চিহ্ন আঁকা। লণ্ডন এবং কলকাতার হালচাল, পারিবারিক খবর এবং নানা প্রসঙ্গে কিছু

খুচরো খুচরো আলাপের পর হঠাৎ আলীসাহেবের খুব কাছে ঘন হয়ে বসে মিসেস গ্ল্যাডিস বললেন, ডি. এম 'এর বাংলোয় আর কখনো গিয়েছিলেন না কি ?

—না, ম্যাডাম—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের রেসিডেন্স কি যখন তখন হুটহাট করে যাওয়া যায় ?

—আপনি কি সেই ফ্যাণ্টম পিআনো মিউজিকের স্টোরি লিখে ফেলেছেন ?

—না, কি করে লিখবো, মিস্ট্রিই তো জানতে পারি নি। একটু থেমে আলীসাহেব বললেন, ওই বাংলোয় কোন সময়ে কোন মিউজিসিয়ান ছিলেন কি না—

তাকে হাতের ইশারায় থেমে যেতে বললেন গ্ল্যাডিংস। কিন্তু কেমন যেন গম্ভীর আর কঠোর হয়ে উঠল তাঁর মুখখানা। একটা কথাও বললেন না। শুধু মাথাটা নীচু করে দু'হাত নেড়ে বুকে ক্রুশের মুদ্রা এ কে ফিসফিসিয়ে বললেন, আমেন ! কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে আবার বললেন, সবই তো লর্ড যীশুর ইচ্ছাতেই হচ্ছে !

—কি হয়েছে ?

—আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে বলেই হয়তো একেবারে মির‍্যাকেলি পিআনোর সেই মেলোডির মিস্ট্রিটা জানতে পেরেছি।

—স্ট্রেঞ্জ ! তাই না কি ? কি ব্যাপার—কি সেই রহস্য ?

কোন কথাই বললেন না গ্ল্যাডিংস। বিষণ্ণতার ছায়া থমথম করতে লাগল তাঁর মুখে। আলীসাহেবের মনে হলো, বিশ বছর আগের দুর্যোগ-পূর্ণ রাত্রির সেই ভয়াবহ দুঃস্মৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে গিয়েছেন মিসেস গ্ল্যাডিস। কেমন নিভু নিভু গলায় বললেন, জানেন আলীসাহেব, আমি যদি জানতাম সেই পিআনোর আড়ালে ওইরকম মর্মান্তিক একটা ট্র্যাজেডির হিস্ট্রি আছে তাহলে আমি কখনো সুরের শিল্পীকে দেখার জন্য সেই রাত্রে বৃষ্টি মাথায় করে জঙ্গল ভেঙে ছুটতাম না।

—পিআনোর কি ট্র্যাজেডি ম্যাডাম—কেমন করে জানলেন ?

—সে অনেক কথা আলীসাহেব, চোখদু'টো জানালার বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে যেন কোন দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে বললেন গ্ল্যাডিংস, সব—সবকিছুই কেমন আশ্চর্য মনে হয় !

আলীসাহেবের মনটা কৌতূহলে চিন্‌চিন্‌ করে জ্বলে যাচ্ছে। মিসেস গ্ল্যাডিংসের আত্মমগ্ন ভাবটাকে বিঘ্নিত করে কোন প্রশ্ন করবো না করবো না করেও বললেন, কী, খুব আশ্চর্য মনে হয় মিসেস গ্ল্যাডিংস ?

—কি আবার—সেই বিশ বছর আগে যা দেখেছিলাম ডি. এম.'এর বাংলোতে আর বিলেতে যা শুনেছি সেই পিআনো সম্বন্ধে—

—আমার তো বেশ স্পষ্ট মনে আছে, আপনি প্রথমে একদিন চাঁদিনী রাত্রে কার একটা কান্নার আওয়াজ শুনে নীচে নেমে এসে দেখেছিলেন, আলীসাহেব সূত্র ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, সেই সবসময়ে বন্ধ থাকা ঘরটায় এক রমণীর ছায়ামূর্তি টেবিলের মত কি একটা জড়িয়ে—

—অ্যান্ড্রু ল্যাঙের (Andrew Lang) লেখা 'ড্রিমস অ্যান্ড গোস্টস' (Dreams and Ghosts) বইটি পড়া আছে আলীসাহেব ? হঠাৎ বাধা দিয়ে বললেন মিসেস গ্ল্যাডিংস।

আলীসাহেব মাথা ঝাঁকালেন।

—প্রেততত্ত্ববিদ ল্যাঙসাহেব এই বইতে তাঁর একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে গ্ল্যাডিংস বললেন, মি ল্যাঙের সেই একসপিরিয়েন্সের সঙ্গে আলিপুরের পিআনোর ট্র্যাজেডিরও একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।

—কি রকম ? তীব্র আগ্রহে আব্দুল আলীর চোখদু'টো জ্বলজ্বল করে।

—১৮৭৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের ঘটনা, মিসেস গ্ল্যাডিংস বলতে শুরু করলেন, ভিয়েনার এক বেশ ওয়েল-টু-ডু সিটিজেন জন গফ্‌'এর স্ত্রী মেরী মারা গেলেন। মেরী ছিলেন অত্যন্ত বৈষয়িক। কণ্ট্রাক্টার ডেকে বাড়ির প্ল্যান বুঝিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রাজমিস্ত্রীদের কাজ দেখা, হাটবাজার করা, ঝি-চাকর খাটানো, সংসারের সব—সব কাজ নিজে হাতে করতেন তিনি। মি. গফ্‌ ছিলেন শেয়ার মার্কেটের দালাল। সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরতেন। সংসারের কোন দিকে চোখ তুলেও তাকাতেন না।—একটু থামলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস। আবার বললেন, একেবারে নির্জলা সত্যি ঘটনা আলীসাহেব। সেই মেরী তাঁর মৃত্যুর মাসছয়েক আগে একটা ডাইনিং টেবিল কিনেছিলেন। একসঙ্গে চারজন খেতে পারে এমন ডাইনিং টেবিল। ওপরে সানমাইকা দেওয়া। এই খাওয়ার টেবিল তিনি নিজ

হাতে ঝাড়পোছ করতেন দু'বেলা। এতুটুকু নোংরা লেগে থাকলে মেডসারভেণ্টকে বকাবকি করে বাড়ি মাথায় করতেন। এককথায় এই টেবিলটা ছিল মেরীর প্রাণের চেয়েও প্রিয়। মৃত্যুর কয়েকমুহূর্ত আগে মি গফের হাতদু'টো ধরে তিনি বলেও গিয়েছিলেন, ডাইনিং টেবিলটার যেন কোন অযত্ন না হয়।

মাস ছয়েক যেতে না যেতে মি গফ্ আবার বিয়ে করলেন মার্গারেটকে। মেরীর একেবারে উল্টো স্বভাবের মেয়ে—দিনরাত সিনেমা, বায়োস্কোপ, থিয়েটার, পার্টি আর আউটিং নিয়ে মেতে থাকতো মার্গারেট। ঝি-চাকর কুক যা করতো, যেমন করতো তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হতো গফকে। কিচ্ছু বলতে সাহস করতেন না মার্গারেটকে। দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী স্ত্রী!

একদিন হলো কি—থিয়েটার দেখে খুব ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরল মার্গারেট। কুক এসে খবর দিয়ে গেল, ডাইনিং টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। মার্গারেট চোখে মুখে জল দিয়ে খাওয়ার ঘরে পা দিয়েই আঁতকে উঠল—স্পষ্ট দেখল একটি মহিলার ছায়ামূর্তি ডাইনিং টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে।

কে—কে আপনি—আতংকে চিৎকার করে উঠতেই সেই ছায়াদেহ মিলিয়ে গেল চোখের পলকে।

আরও একদিন। মি. গফ্ আর মার্গারেট দুইজনেই ডিনারে বসেছে। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এল। মার্গারেটের মনে হলো, প্রচণ্ড জোরে তার চেয়ারটা কেউ যেন পিছনে টানছে। দড়াম্ করে চেয়ারসুদ্ধ মেঝেয় পড়ে গেল মার্গারেট। গফ্ তো একেবারে অবাক। তাঁর মনে হলো, মার্গারেটের নিশ্চয়ই ফিট-টিটের ব্যামো হয়েছে। সেইদিন রাত্রেই কম্প দিয়ে জ্বর এল তার।

দেড়মাস ধরে কত চিকিৎসা হলো, কত বড় বড় ডাক্তার এল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। পাড়ার কয়েকজন বৃদ্ধের পরামর্শে জন গফ্ এলেন স্পিরিচুয়্যালিস্ট অ্যাণ্ড্রু ল্যাংগের কাছে। সব বৃত্তান্ত বললেন গফ্। মি. ল্যাংগ এলেন। পেশাণ্টকে কিছুক্ষণ দেখেই হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে করুণ মিনতি জানিয়ে মৃতা মেরীর উদ্দেশ্যে বললেন, আপনার এই সংসার—স্বামী—আপনার এই বাড়ির প্রতিটি জিনিস. আপনার ওই ডাইনিং টেবিলটা খুব প্রিয় জানি। কিন্তু

সংসারের তুচ্ছ এসব জিনিসের প্রতি আপনার এত 'অ্যাটাচমেণ্ট' কেন ? এইজন্যেই নিজেও শান্তি পাচ্ছেন না যেমন তেমনি ওরাও শান্তি পাচ্ছে না। আমি মার্গারেটের হয়ে কথা দিচ্ছি উনি আপনার এই সংসারের, আপনার ডাইনিং টেবিলের যত্ন করবেন। আপনি অনুগ্রহ করে ওকে ছেড়ে দিন।

তারপরের দিনই জ্বর ছেড়ে গেল মার্গারেটের। প্রতিদিন সে নিজের হাতে ডাইনিং টেবিলটা 'ক্লীন' করতো। আর কোন দিন জন গফের বাড়িতে কোন উপদ্রব হয় নি।

থামলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে শান্ত নির্জন বেকার রোডে। বাংলোর কম্পাউণ্ডে কৃষ্ণচূড়ার ঝিরি-ঝিরি পাতায় রাস্তার আলোর ঝিলিমিলির দিকে দৃষ্টি রেখে গ্ল্যাডিংস গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। খুব আস্তে আস্তে বললেন, এই ঘটনার বৃত্তান্ত-কথা লিখে মি. ল্যাংগ মন্তব্য করেছেন, মৃত্যুর পর স্থূলদেহ ধ্বংস হলেও আনস্যাটিসফায়েড ডিজায়ার, অর্থাৎ অতৃপ্ত বাসনা এবং কামনায় ভরা 'সোল' কিছুতেই পার্থিব জীবনের মায়া কাটাতে পারে না। জীবিত কালে তার মনে যার প্রতি এবং যে-জিনিসের প্রতি অ্যাটাচমেণ্ট থাকে, তার সোলের অ্যাট্রাকশান সেইদিকেই তত বেশি হয়। আর এই আকর্ষণ কিছুতেই তার আত্মাকে উর্ধ্বগামী হতে দেয় না। একটু থেমে বাইরে আসন্ন রাত্রির রঙে মলিন হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে আবার বললেন গ্ল্যাডিংস, ঠিক এই রকমই একটা ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে ডি এম.'এর বাংলোর সেই পিআনোর সংগে।

ঘরের ভেতরের নিস্তব্ধতা লেখকের অসহ্য মনে হলো। আলীসাহেবের মনে ভীড় করে এল অনেক—অনেক প্রশ্ন—বিলেত থেকে পিআনো সম্বন্ধে কি জেনেছেন মিসেস গ্ল্যাডিংস ? আর এমন কি জেনেছেন যা বলতে গিয়ে তিনি এত কষ্ট অনুভব করছেন ?

মিসেস গ্ল্যাডিংস তাঁকে সব কথা বলবেন বলেই ডেকেছিলেন। পিআনোর রহস্য সম্বন্ধে যা জেনে এসেছিলেন সবই বলেছিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তাঁর সেই দীর্ঘ বিবৃতিকে ভিত্তি করে আলীসাহেব লিখেছিলেন **Ghost stories of Old Calcutta.**

১৯২৭ সালের প্রথমদিকে থ্যাকারের সংগে বিলেত ফিরে যাওয়ার ঠিক

বারো বছর পরে যখন মিসেস গ্ল্যাডিংসের মনে পিআনোর সেই দুঃস্মৃতিটা প্রায় ফিকে হয়ে এসেছে এমন সময়ে তিনি জানতে পেরেছিলেন নিশীথ রাত্রির সেই স্বরলহরীর বিস্ময়কর ইতিহাস।

একদিন একটা চিঠি পেলেন গ্ল্যাডিংস। তাঁর সুদূর বাল্যকালের এক বান্ধবী মিসেস এলারটন লিখেছেন, লণ্ডনে যেকোন মুহূর্তে বোম্বিং (তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে) হতে পারে। তুমি এখানে আমার কাণ্ট্রি হাউসে চলে এসো। এখানে খুব আরামে ও নিরাপদে থাকবে।

বোমার ভয়ে লণ্ডন ছেড়ে কোথায় যাওয়া যায় ভেবে দিশেহারা হয়ে উঠেছিলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস। অতএব সাদর আমন্ত্রণটা প্রত্যাখান করলেন না।

লণ্ডন থেকে অনেক—অনেক দূরে প্রায় আয়ারল্যাণ্ডের সীমানায় এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম গ্ল্যামোরগ্যানশায়ারে মিসেস এলারটনের বাড়িতে এলেন গ্ল্যাডিংস। বাড়ির কম্পাউণ্ডে পা দিতেই এলারটনের উচ্ছ্বসিত কলরব শোনা গেল—কি রে এসেছিস? আয়—আয়। পথে কোন কষ্ট হয় নি তো ভাই?

দীর্ঘদিনের ব্যবধানে অন্তরঙ্গ দুই বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে যা হয়—যা হয়ে থাকে—পুরো একটা সপ্তাহ যেন খুশীর হাওয়ায় শরতের হাল্কা মেঘের মত উড়ে গেল।

একদিন দুই বন্ধু বাগানে বেড়াচ্ছেন। শীতের সকালের হলদে রোদের টোপর পরে মাথা দোলাচ্ছে রাশি রাশি ডালিয়া। সারি সারি ফার্নের ঝিরি-ঝিরি পাতায় পাতায় ভোরের বাতাস আকুলিবিকুলি করছে। শিশিরে ভেজা ঘন বেগুনীরঙের ক্রিসেন্থিমামগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে হঠাৎ গ্ল্যাডিংস বললেন আচ্ছা এলারটন, তোদের বাড়িটা মিডিয়াভেল পিরিয়ডের একটা ক্যাসলের (দুর্গের) মত কেন রে?

কোন কথা বললেন না এলারটন। শুধু চোখদু'টো ছড়িয়ে দিলেন সত্যিই মধ্যযুগীয় দুর্গের মত অদ্ভুত বাড়িটার দিকে। বেশ উঁচু একটা টিলার ওপরে রক্তবর্ণ পাথরে তৈরি প্রাসাদের চারিদিকে উঁচু পাচিল। সেই প্রাচীরের বাইরে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ঢালু জমি। মনে হয়, একদা এই প্রাসাদকে বেষ্টন করে ছিল পরিখা। আরও কয়েকমুহূর্ত কি যেন চিন্তা

করে অস্ফুটস্বরে বললেন, তুই তো জানিস—উনি (মি. এলারটন) ছিলেন ব্যারনের বংশধর। এটা ওঁদের পৈতৃক—

—আচ্ছা, কতদিনের পুরানো হবে এই বাড়িটা ?

—কম করে দুইশো বছর তো হবেই। দূরে—বহুদূরে কুয়াশায় ঝাপসা বিষণ্ণ পাহাড়গুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে আস্তে আস্তে বললেন এলারটন, পুরানোকালের মস্ত এই বাড়িটা যেন-হাঁ করে গিলে খেতে আসে। একটু থেমে আবার বললেন, রাত্রে কেমন ভয় ভয় করে।

—ভয় ? কেন ? সাতদিন তো থাকলাম, রাত্রে তেমন কিছু দেখিনি তো !

কোন কথা বললেন না এলারটন। নিঃশব্দে তাঁর শুকনো ঠোঁটের কোনে একটা হাসির আভা জেগে উঠল। কিন্তু কয়েকমুহূর্ত পরেই কেন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। আচমকা কিছু মনে পড়ে গিয়েছে এমন করে বললেন এলারটন—আজ কি বার রে গ্ল্যাডিংস ?

—কেন—বুধবার।

—তারিখ ?

—২৩শে ডিসেম্বর ১৯৩৯ সাল, বিস্মিত হয়ে গ্ল্যাডিংস বললেন, কেন বল তো তুই সন-তারিখের হিসাব নিচ্ছিস ?

কোন কথা বললেন না এলারটন। আঙুলের কর গুণে গুণে কি যেন হিসাব করলেন। তারপর যেন অনেক অনেক দূর থেকে বললেন, আজ —আজ রাত্রেই তো তিনি আসবেন !

—কে—আসবে, কার কথা বলছিস তুই ? বিস্ময়ের যন্ত্রণায় গ্ল্যাডিংসের চোখদু'টো ছটফট করতে লাগল।

একটা কথাও বললেন না এলারটন। বলতে চাইলেন না। হয়তো বা বলতে পারলেনও না। শুধু কেমন ধোয়াটে চোখে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অবসন্ন গলায় বললেন, তুই তো জানিস ওঁর মৃত্যুর পর আমি এবাড়িতে এসেছি মাত্র বছর খানেক হলো।

—হ্যাঁ—তুই তো তোদের ব্রিস্টলের বাড়িতে ছিলি।

—তাই তো—এ বাড়ির হালচাল কিছুই জানি না ভাই—শুধু শুনেছি, বলেই হঠাৎ থেমে গেলেন এলারটন। যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল তাঁর মুখে। অস্ফুটস্বরে বললেন, এটা তো ১৯৩৯ সাল ! আজকে-দশবছর পূর্ণ হলো। আজই রাত্রে তিনি আসবেন।

—তুই কি কোন স্পিরিটের কথা বলছিস ?

—দেখা-ই যাক না, তুই তো থাকবি আমার সংগে।

গ্যামোরগ্যানশায়ারের সেই জংগলাকীর্ণ প্রাসাদের চারিদিকে রাত্রি নামল ঘন হয়ে। ঘুম নেই দুই বন্ধুর চোখে। তাঁরা জানালার কাঁচের শার্শিতে চোখ রেখে আকুল আগ্রহে তাকিয়ে আছেন বাইরে। সেই টিলা থেকে নীচের বাড়িগুলোকে মনে হচ্ছে যেন কাকজ্যোৎস্নায় সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি কবরের মত। হঠাৎ কোথা থেকে তীক্ষ্ণ একটা হাওয়ার ঝলক বয়ে এল। বাগানের শেষপ্রান্তে দীর্ঘ ইউক্যালিপটাসের সরু সরু পাতায় শাঁ শাঁ করে কান্নার মত শব্দ বাজল। হঠাৎ তাঁদের মনে হলো, প্রাচীন ওক গাছটার নীচে একটা অতিলৌকিক ছায়া কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। আর ঠিক সেই সময়ই সুষুপ্ত পৃথিবীর নিথর স্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে একটা শব্দ বেজে উঠল—ঠুন-ঠুন-ঠুন। সেই আওয়াজটা বাতাসে তরংগায়িত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল দূর অন্ধকার দিগন্তে। আর সেই সুপ্রাচীন কালের অট্টালিকার একটি প্রকোষ্ঠের বিনিদ্র দুই প্রৌঢ়াকে বিস্মিত এবং হতবাক করে দিয়ে ঘন কুয়াশায় ছেয়ে থাকা ওকগাছের নীচে ঝাপসা অন্ধকারে ফুটে উঠল অশ্বারূঢ় এক বলিষ্ঠ ছায়ামূর্তি। তারা-ভরা আকাশের পটভূমিতে তার মুখের ছায়াময় আকৃতিতে রাজকীয় আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছাপ। অস্পষ্ট ঘসা ঘসা ছবির মত একে একে পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার অনুচরদের ছায়াদেহ। সেই নিশীথ রাত্রির বুক-জোড়া কুয়াশার ভেতরে জ্বলন্ত রক্তের ছিটের মত জ্বলে উঠল এক-একটি মশাল। সেই মশালের আলোয় রহস্যময় রাজপুরুষের নেতৃত্বে শুরু হলো তার অনুগামীদের শোভাযাত্রা। ছায়াবাজির এক বিশাল জটলার মত সেই মিছিল প্রধান তোরণ দিয়ে বেরিয়ে ধীর পদক্ষেপে প্রাসাদ পরিক্রমা করে বাগানেরই গাছগাছালির ঝুপসী অন্ধকারে মিলিয়ে গেল !

—কী আশ্চর্য—এরা কারা ?

—উনিই তো দশ বছর পর পর ঠিক এই দিনটিতে দেখা দেন তাঁর পাত্র-মিত্র সহ। একটু থেমে অভিভূত সেই আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে মিসেস এলারটন কেমন অস্পষ্ট গলায় বললেন, আমার স্বামী তো আমাকে কিছুই বলে যাননি। ব্রিস্টলে মৃত্যুর আগে শুধু বলেছিলেন গ্যামোরগ্যানশায়ারে তাঁদের একটা পৈতৃক বাড়ি আছে। তবে আমি সেখানে থাকতে পারবো

কি না তা তিনি বলতে পারেন না—হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন এলারটন। গ্ল্যাডিংসের বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, এখানে আসার পর থেকেই স্থানীয় লোকের মুখে শুনছি এটা নাকি গোস্ট হণ্টেড হাউস! আব দশ বছর পর পব এই অলৌকিক কাণ্ডটা ঘটে। কিন্তু কে ওই বাজপুরুষ—কার বিদেহী আত্মা সে-সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারে না। তুই গোস্ট-টোস্ট নিয়ে ইণ্টারেস্টেড বলেই তো ডেকে পাঠিয়েছি তোকে।

মিসেস এলারটন কি বলছেন, কাকে বলছেন কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছেন না গ্ল্যাডিংস। তাঁর মনের ভেতরে ভেসে উঠল, সুদূর আলিপুরের ডি. এম 'এব বাংলোর রুদ্ধ ঘরেব ঘন অন্ধকাবে রহস্যময়ী সেই রমণীর ছায়াদেহ, সেই দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে পিআনোর করুণ মধুব স্বরকে অনুসরণ করে বনজংগল ভেঙে উর্ধশ্বাসে ছুটে যাওয়া—সুদীর্ঘ তেব বছব আগেব সেই দুঃসহ স্মৃতির পীড়নে তাঁর চেতনা যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে এল।

—কি এত ভাবছিস বল তো?

মিসেস এলারটনেব কথায় ধাক্কা খেয়ে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন গ্ল্যাডিংস। বন্ধুর মুখের দিকে না তাকিয়ে আচ্ছন্নেব মত বিড়বিড় করে বললেন, ভালো জায়গায় এনেছিস দেখছি -হঠাৎ নিজেকে একটা যেন প্রচণ্ড ঝাকুনি দিয়ে সংযত আর স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে বললেন, আশ্চর্য লোক তুই? তোর জানতে ইচ্ছে হয় না কে সেই অশ্বারোহী পুরুষ? এই গ্ল্যামোরগ্যানশায়ারে কি কোন প্রাচীন লোক একটাও নেই যে বলতে পারে এই স্পিরিটের—উত্তেজনায় রুদ্ধ হয়ে এল গ্ল্যাডিংসের কণ্ঠস্বব। তাঁর কথাগুলোর ভেতরে উত্তাপের রেশ ফুটে উঠল।

—তোকে এখানে ডেকে এনেছি বলে কি তুই রাগ করেছিস গ্ল্যাডিংস, প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধের ছায়া পড়ল এলারটনের মুখে। একটু থেমে সসংকোচে আবার থেমে থেমে বললেন, কি করবো ভাই, এখানকার ওই পাহাড়ের ঢালুতে বুইল্ট ক্যাসল, ডাম্বারটন ক্যাসল সব—সব দুর্গ-প্রাসাদই নাকি হণ্টেড—

—স্ট্রেঞ্জ! এই বাড়িগুলোর হিস্ট্রি কেউ জানে না?

—শুনেছি প্রেমবোকশায়ারের এক ওল্ড ম্যান নাকি জানেন সব—তাঁর সেখানে সব্চাইতে বড় ফার্ম হাউস। একটু থেমে এলারটন বললেন আবার, উনি নাকি তোর মতই ইণ্ডিয়াতেও বহুকাল ছিলেন।

—রিয়েলি ? চল-চল—কালই সকালে চল তাঁর কাছে।

দুই বন্ধু। দুই প্রৌঢ়া।

দুই ঘোড়ায় টানা খোলা গাড়িতে করে এলেন প্রেমবোকশায়ারে। চারিদিকে কম্পাউণ্ডওয়াল দিয়ে ঘেরা ফার্ম-হাউস। ঘন সবুজের ছবির মত লনের ভেতরে সুরকি-বিছানো চক্রাকার পথ দিয়ে ঘুরে গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনে। ড্রইংরুমে বসে খবর দিতেই বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। চোখেমুখে আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছাপ।

—নমস্কার। আমিই জেমস ডোনাল্ড। বলুন, কি দরকার ?

মিসেস এলারটন নিজের পরিচয় দিতেই বৃদ্ধের ধূসর চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, আপনার শ্বশুরমশাই ব্যারন ও'ডোনহো ছিলেন আমার পিতৃদেবের বাল্যবন্ধু। আপনার স্বামীও আমার বন্ধু। আপনাদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সৌহার্দ্য—একটু থেমে মিসেস এলারটনের বিব্রত মুখখানার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন ডোনাল্ড, এতদিন আসেন নি কেন ? শুনেছি ব্রিস্টল থেকে তো এসেছেন অনেক দিন। একটু থেমে মিসেস গ্ল্যাডিংসের দিকে ইশারা করে বললেন, ইনি কে ?

—ওনার পরিচয়, আমার ছোটবেলার বন্ধু মিসেস গ্ল্যাডিংস !

—বাঃ, বেশ—বেশ। আপনিও এসেছেন দেখে খুব খুশী হয়েছি মিসেস গ্ল্যাডিংস।

আরও কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর মিসেস এলারটন বিগত রাত্রের অলৌকিক ঘটনার কথা বলতেই ডোনাল্ড বললেন, ও, এই ব্যাপার ! আয়ারল্যাণ্ড আর ইংল্যাণ্ডের সীমানায় গ্ল্যামোরগ্যানশায়ারের কাউণ্টির প্রায় সব পুরোনো দুর্গপ্রাসাদ অর্থাৎ ক্যাসলই গোস্ট-হণ্টেড হাউস।

—সে তো আমি জানি মি ডোনাল্ড। কিন্তু ওই বুইল্ট ক্যাসলে কেন দেখা যায় এক সুন্দরী রমণীর ছায়াদেহ, কেন ডাম্বারটন ক্যাসলে দেখা যায় চার ঘোড়ায় টানা একটা কালো গাড়ির ছায়া ছুটে আসে সমুদ্রের দিক থেকে ?

—বলছি-বলছি— আমি যেটুকু জানি বলছি, তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন ডোনাল্ড, প্রতিটি গোস্ট হণ্টেড হাউসেরই একটা হিস্ট্রি আছে। একটু থেমে কেন যেন গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন, প্রেতের আনাগোনা যে বাড়িতে থাকে, সে বাড়ির ইতিহাস কিছুটা কিংবদন্তীর মতও হয়ে যায়।

—কি রকম ? বুইল্ট ক্যাসলের মহিলার হিস্ট্রিটা কি ?

—বুইল্ট ক্যাসলটা হলো পর্তুগালের এক কাউণ্ট ও'নীয়েলের বিলেতের রেসিডেন্স। ও'নীয়েল ছিলেন অসাধারণ মাইজার অর্থাৎ কৃপণ। তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্মদিনে প্রতি বছর দিতেন একটা মুদ্রা। পরের দিনই আবার ফিরিয়ে নিতেন। ও'নীয়েল টাকাপয়সা সম্পত্তি ছাড়া কিচ্ছু বুঝতেন না। তাঁর নিশ্বাসেও ছিল টাকার গন্ধ। ও'নীয়েলের কাছে তাঁর মেয়ের জন্মদিনের মুদ্রা যখন হলো ত্রিশটা, সেই সময় সেই জনমানবহীন শ্মশানের মতো বাড়িতে এল দূর সম্বন্ধের এক আত্মীয় যুবক। একটু থেমে মন্ত্রমুগ্ধের মত আবিষ্ট দুই মহিলার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, এই তরুণের সঙ্গে যেই প্রণয়াসক্ত হলো মেয়েটি অমনি ঘটে গেল একটা দুর্ঘটনা।

একদিন দেখা গেল গভীর খাদে যুবকের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পরের দিন এই ক্যাসলে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল, এই পর্যন্ত বলে থামলেন ডোনাল্ড। কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে বললেন, গভীর রাত্রে তণ্বী সুন্দরীর প্রেতচ্ছায়া দেখা যায়—লোকে বলে সে ওই কাউণ্টের মেয়ে। কিংবদন্তী একথাও বলে যে, রাত্রে দেখা যায় ওই মেয়েটির ছায়াদেহ কোন খুশীর উল্লাসে নাচছে ; কাউকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আর সে দৃশ্য যার চোখে পড়বে সে না কি বাঁচে না।

—ডাম্বারটন ক্যাসলের কালো গাড়ি ?

—ওই একই রকম ইতিহাস। এই ক্যাসলের মালিক ছিলেন এক অত্যাচারী জমিদার। তাঁর জঘন্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর প্রজারা তাঁকে সমুদ্রে ডুবিয়ে খুন করেছিল। একটু থেমে ছাড়া ছাড়া গলায় আবার বললেন, এখানকার স্যান ক্যাসল, সেণ্ট ডোনেট ক্যাসলের মত আর আর সব পুরানো বাড়িই হণ্টেড হাউস—থামলেন ডোনাল্ড।

মিসেস এলারটন দূরে জঙ্গলাকীর্ণ খাড়া পাহাড়ের গায়ে স্যান ক্যাসলের ধ্বংসাবশেষের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

—আচ্ছা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো—মিসেস গ্ল্যাডিস সসংকোচে বললেন, আমার বন্ধু বলছিল, আপনি নাকি ইণ্ডিয়াতে ছিলেন ?

—হ্যাঁ ম্যাডাম।

—কোথায় ছিলেন ?

—বেঙ্গলে—একটু থেমে যেন সাবেকদিনের কোন স্মৃতি নিয়ে মনের ভেতরে নাড়াচড়া করতে করতে বললেন ডোনাল্ড, উনিশশো বারো থেকে উনিশশো পনের—তিন বছর আমি টুয়েণ্টিফোর পরগনার ডি এম. ছিলাম।

—কি বললেন! তীব্র উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠলেন গ্ল্যাডিংস। তাঁর মাথার ভেতরে ফেটে পড়ল রক্তের উচ্ছ্বাস। কোন রকমে নিজেকে সংযত করে বললেন, আপনি কি আলিপুরের টালিনালা আর জেলখানার মাঝখানে ডি. এম.'এর সেই বাংলোতে ছিলেন ?

—হ্যাঁ ম্যাডাম, গ্ল্যাডিংসের উত্তেজিত এবং উদ্‌ভ্রান্ত মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডোনাল্ড বললেন, মনে হচ্ছে—আপনিও বোধ হয় কোন সময়ে সেই বাংলোতে ছিলেন।

কোন কথা বললেন না গ্ল্যাডিংস। বলতে পারলেন না।

বিশ বছর—সেই বিশ বছর আগে গভীর নিশীথে কোন সুদূর দেশের সেই রোমাঞ্চকর অলৌকিক ঘটনার টুকরো টুকরো ছবি তার মনের ভেতরে ঠিক ছায়াবাজির মত ফুটে উঠতে লাগল। আর সেই ভয়ংকর দুঃসহ স্মৃতির পীড়নে তাঁর চেতনা কেমন বিকল হয়ে এল।

—নমস্কার, আপনারা একটু চা খাবেন তো, ভেতর থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধা। তাঁর ধারালো নাকে, উজ্জ্বল দুটো চোখে ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং আভিজাত্যের ছাপ এত সুস্পষ্ট যে বলে দিতে হয় না ইনি লেডী ডোনাল্ড। তবুও—

তবুও প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে চব্বিশ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেট জেমস ডোনাল্ড আগন্তুক দুই মহিলার সংগে স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। আর মিসেস গ্ল্যাডিংসকে আবার প্রশ্ন করলেন, আপনি কোন সময় আলিপুরে ডি. এম.'এর বাংলোতে ছিলেন ?

—নাইণ্টিন টুয়েণ্টিসিকসে।

—তখন ম্যাজিস্ট্রেট কে ছিলেন ?

—মি. থ্যাকারে।

—ও মাই গড—আপনিও আলিপুরে ডি. এম.'এর রেসিডেন্সে ছিলেন, কলকল করে বললেন লেডী ডোনাল্ড। ফার্স্ট গ্রেট ওয়ারে আমি, আমার মা

—বলেই হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। বেদনার ছায়া ভেসে উঠল তাঁর মুখে। আর একটা কথাও বললেন না তিনি। কয়েক মুহূর্ত পরে কি ভেবে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বললেন, আমরা প্রায় চারবছর ছিলাম বেঙ্গলে।

ডোনাল্ড কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে গ্ল্যাডিংসের মনের ভেতরের আলোড়নটাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে বললেন, আপনি কি বেঙ্গলের 'আই মীন' আলিপুরের ডি. এম 'এর রেসিডেন্স সম্বন্ধে কিছু বলবেন ?

ইয়েস স্যার। বিশ বছর আগে সে-বাড়িতে এমন একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখেছিলাম—যার কোন সায়েণ্টিফিক এক্সপ্ল্যানেশান আমি আজও খুঁজে পাই নি—

মিসেস গ্ল্যাডিংস তাদের বলেছিলেন। বলেছিলেন, সেই একতলার বন্ধ ঘরে ছায়ামূর্তির করুণ আর্তনাদ, বলেছিলেন সেই টেবিলের মত কি একটা জড়িয়ে ধরে সেই কান্নায় থরো-থরো ছায়াদেহের কথা ; কিন্তু সেই ঝড়-জলের রাত্রে পিআনোর সুরকে অনুসরণ করে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে যাওয়ার বৃত্তান্ত বলতেই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল ঘরে—

ও !—মাই গড ! গ্ল্যাডিংসের কথা শেষ হওয়ার আগেই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিলেন লেডী ডোনাল্ড। আর কেমন বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিল তাঁর রোগা রোগা মুখখানা। দুই হাতে বুক চেপে ধরে যেন তীব্র কোন যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে কান্নায় ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট গলায় বললেন, উনি—উনিই আমার—আমার মা। বলেই কেমন নিষ্পলক, শূন্য দৃষ্টিতে দূরে আকাশের গায়ে আঁকা ধূসর পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

গভীর শোকের মত নিথর স্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। কিছুক্ষণ পর যেন নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে বললেন জেমস ডোনাল্ড,—আচ্ছা, আপনি কবে প্রথম দেখেছিলেন সেই কালো ছায়ামূর্তি, মিসেস গ্ল্যাডিংস ?

আমার স্পষ্ট মনে আছে ১২ই মার্চ, ১৯২৬ সাল।

স্ট্রেঞ্জ ! ঠিক ওই দিনেই তো মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, উত্তেজনায় হাঁসফাঁস করতে করতে বললেন মিসেস ডোনাল্ড।

তাঁর কথায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করে ডোনাল্ড আবার প্রশ্ন করলেন, আর কবে সেই সুর শুনে ছুটেছিলেন ?

সেটা ছিল বর্ষার একটা দিন—তারও তারিখ মনে আছে, একটু থেমে স্মৃতির ভেতরে তুরপুন চালিয়ে মিসেস গ্ল্যাডিংস বললেন, টুয়েণ্টি-ফার্স্ট জুলাই, টুয়েণ্টি-ফার্স্ট জুলাই ! নাইণ্টিন-হাণ্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েণ্টি-সিকস !

আর্তনাদ করে উঠলেন মিসেস ডোনাল্ড। রুদ্ধশ্বাসে বললেন, ওইদিন—ওইদিনই তো মা মারা যান—ইজ নট ইট ডার্লিং ?

ঘরে যেন একটা বাজ পড়েছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু ঘরের প্রত্যেকের মনে ঘনিয়ে আসে একটা প্রশ্ন—রোগগ্রস্ত অবস্থায় কিম্বা মৃত্যুর আগে কি মানুষের স্পিরিট তার প্রিয়তম কোন জিনিসের দুর্বার আকর্ষণে অতি দূর দেশে যেতে পারে ?

বহুদর্শী এবং প্রেতবিদ্যাবিশেষজ্ঞ জেমস ডোনাল্ড হয়তো প্রত্যেকের মনের অবস্থা অনুধাবন করেই আস্তে আস্তে বললেন, আপনারা টেলিস্থেসিয়া (Telesthesia) এবং ট্র্যাভেলিং ক্লেয়ারভয়েন্স (Travelling Clairvoyance)—এই দু'টো কথা কখনো শুনেছেন ?

ঘরের সবাই মাথা নাড়ল।

—এই দু'টো কথার অর্থ হলো দিব্যদৃষ্টি বা আকাশদৃষ্টি এবং দূরবিজ্ঞপ্তি (Travelling Clairvoyance)। যোগীরা যেমন সূক্ষ্ম দেহে দূরদেশে গিয়ে কোন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে চলে আসতে পারেন তেমনি অসুস্থ বা মুমূর্ষু অবস্থায় সাধারণ লোকও মাঝে মাঝে তাদের অজ্ঞাতসারে দিব্যদৃষ্টি পেতে পারে এবং সূক্ষ্মদেহে অনেক দূরদেশে তার কোন প্রিয়জন কি প্রিয় বস্তুর কাছে গিয়ে ফিরে আসতে পারে—থিয়োসফিস্টরা এই অলৌকিক ঘটনাকেই বলেছেন টেলিস্থেসিয়া এবং ট্র্যাভেলিং ক্লেয়ারভয়েন্স। থামলেন ডোনাল্ড শ্রোতাদের। মুগ্ধ বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে, আবার বললেন, স্পিরিচুয়্যালিস্ট মিসেস ক্রাউ (Mrs Crow)-এর লেখা The Nightside of the Nature গ্রন্থে আছে—

ফিলাডেলফিয়ায় এক ভদ্রমহিলা অনেক দিন থেকে অসুখে ভুগতে ভুগতে যখন মুমূর্ষু অবস্থায় এলেন তখন তার প্রবল ইচ্ছে হলো স্বামীকে দেখতে। ভদ্রলোক ছিলেন এক সওদাগরী জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং তিনি তখন পৃথিবীর কোন বন্দরে, কোন শহরে আছেন তা বহু চেষ্টা করেও জানা যায় নি। মৃত্যুর আগের দিন ভদ্রমহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। পরের দিন তাঁর অসুখের প্রকোপ কম দেখা গেল। ভদ্রমহিলা তাঁর মা-কে

বললেন, মা, আমি কাল রাত্রে তোমার জামাইকে দেখেছি। লণ্ডনে এক হোটেলে বসে বেশ সুস্থ অবস্থায় কফি খাচ্ছে। একটু থেমে ক্ষীণ স্বরে আবার বললেন, যাক, ও ভালো আছে, ওকে দেখেছি—এখন আমার মরতে কোন দুঃখ নেই, বলতে বলতেই মৃত্যুপথযাত্রীর চোখদুটো জলে ভরে এল।

ভদ্রলোক দেশে ফিরে এলে তাঁর বাড়ির লোক এই বৃত্তান্ত বলতেই তিনি বললেন, সেই রাত্রেই আমি মেরীকে দেখেছিলাম এবং খুব দুঃস্বপ্নও দেখেছিলাম ওকে নিয়ে। তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।*

ট্র্যাভেলিং ক্লেয়ারভয়েন্সের আরও একটি ঘটনা বলছিলেন ডোনাল্ড।

মনোবিজ্ঞানী এবং অধ্যাপক রাইনের (Rhine) স্ত্রী দুপুররাতে ধড়মড় করে জেগে উঠেই স্বামীকে বললেন, তাঁকে এখুনি নয় মাইল দূরে তাঁর পিত্রালয়ে নিয়ে যেতে। প্রফেসার রাইন কারণ জিজ্ঞাসা করতেই মিসেস জানালেন তাঁর দাদাকে নিয়ে বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর দাদা বিকেলে গোয়ালঘরে গোরু-বাছুর তুলে রেখে খড়ের গাদার ওপরে বসেছিলেন। তারপর সেখানেই পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

অধ্যাপক রাইন তাঁর সম্বন্ধীর বাড়িতে এসে দেখলেন, তাঁর স্ত্রী যে-দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন ঠিক তাই ঘটে গিয়েছে আগের দিন বিকেলে। শুধু অসুস্থ নয়, সুস্থ মানুষও স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম দেহে ভ্রমণ করতে পারে—এটা তার প্রমাণ।†

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে কি ভেবে জেমস ডোনাল্ড ছাড়া ছাড়া গলায় বললেন, আমার শাশুড়ীর বিদেহী আত্মা বা স্পিরিট ডেফিনিটলি অসুস্থ অবস্থায় এবং মৃত্যুর আগে আলিপুরে ডি এম 'এর রেসিডেন্সে গিয়েছিল।

—তিনি কি পিআনো বাজাতে পারতেন? গ্ল্যাডিসের চোখদুটো উৎসুক হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, তিনি ছিলেন খুব বড় মিউজিসিয়ান। আমাদের সঙ্গে তিনিও আলিপুরের বাড়িতে ছিলেন। তাঁর বাজনা শোনার জন্য ইউরোপিয়ান অফিসাররা দল বেঁধে আসতেন আমার কোয়ার্টারে।

—বীঠোফেনের নাইন্থ সিম্ফোনিতে আমার মা-র জুড়ি ছিল না, মাথা নীচু করে অস্ফুটস্বরে বললেন লেডী ডোনাল্ড। চফিন, মোজ্যার্ট—প্রতিটি

*Mrs Crow. The Nightside of Nature.
†Prof. Rhine. New Frontiers of the Mind.

সুরশিল্পীর সুর তুলতে পারতেন না। একটু থেমে আবার বললেন, খুব শখ করে লেটেস্ট মডেল ভিয়েনিজ পিআনো কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে পিআনোটা ছিল তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়--সেই পিআনো—

—সেই পিআনোর কি হলো?

—কি আর হবে, আলিপুরের ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট ডোনাল্ড বললেন, আমার টার্ম শেষ হলো। বহু চেষ্টা করে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টিম ন্যাভিগেশান কোম্পানির জাহাজে তিনটা টিকিট পেলাম লণ্ডনের। কিন্তু মুশকিল হলো - কোম্পানি কিছুতেই পিআনোটা নিতে রাজী হলো না। সবে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। তখন অ্যাকোমোডেশান এবং কারগো খুব রেস্ট্রিক্টেড্—

থামলেন ডোনাল্ড। হয়তো পুরানো দিনের স্মৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে গেলেন। আবার আস্তে আস্তে বললেন, আমার মাদার-ইন-ল একেবারে বেঁকে বসলেন—বললেন, পিআনো না নিতে পারলে তিনিও যাবেন না।

আমি এশিয়াটিক স্টিম ন্যাভিগেশান কোম্পানি বাকনাল কোম্পানি, এলারমান স্টিমশিপ—আরও কত জাহাজ কোম্পানির দরজায় দরজায় ঘুরলাম। কিন্তু কিছুতেই কোন শিপিং কনসার্নকে রাজী করাতে পারলাম না—হঠাৎ থেমে গেলেন ডোনাল্ড। ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল বৃদ্ধের মুখে। হয়তো ত্রিশবছর আগের সেই বেদনাদায়ক ঘটনার স্মৃতিই তাঁকে ব্যথাতুর করে তুলেছে।

—শেষপর্যন্ত পিআনোটাকে রেখেই চলে এলেন?

—কি আর করবো, অগত্যা তাই করতে হলো, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বললেন ডোনাল্ড, আমার সাকসেসারকে বলেছিলাম পিআনোটা বিলেতে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, কেউ আর গা করে না। বহু চিঠি লিখে অনেক অনুরোধ করেছিলাম বেঙ্গল গভর্নমেণ্টকে। কিন্তু একটু ইনিশিয়েটিভ নিয়ে কেউ পিআনোটাকে আর পাঠালো না।

—রওনা হওয়ার আগের দিন পিআনোটাকে জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষের মত মা'র সে কী কান্না ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট গলায় এই কথাগুলো বললেন লেডী ডোনাল্ড। আর—আর হয়তো চোখের জল গোপন করার জন্যই দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে গেলেন।